রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় খণ্ড . ১৯৬৬

সম্পাদক অশোকবিজয় রাহা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

O8 G
R.J.
V.2

অগ্রহায়ণ ১৩৭৫
নবেম্বর ১৯৬৮

© বিশ্বভারতী ১৯৬৮

প্রকাশক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন পক্ষে গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্‌ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

সূচীপত্র

মালঞ্চ। নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি-পরিচয়		৬১
'মালঞ্চের নাট্যকরণ'এর কালনির্ণয়		৬৮
মালঞ্চের পাঠান্তর ও পাঠগত মিল		৭৫
মালতী-পুঁথির পরিশিষ্ট		
ভূমিকা		৯৯
তথ্য-সংকলন		১০১
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা : উন্মেষ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়	১৯৭
সম্পাদকের নিবেদন		২১০

চিত্রাবলী

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ১

মালঞ্চ নাটক : পাণ্ডুলিপিচিত্র

ঐ যে জলা চলেছে দাঁতন করতে করতে ৫

রোশনি, ওকে দে তো ঐ আলনার কাপড়খানা ৬

দিদিমণি, একটা পিতলের ঘটি ১০

যেয়োনা, শোনো সরলা ১৩

সরলা দিদিমণি এসেছেন ৫৯

মালঞ্চ উপন্যাস : পাণ্ডুলিপিচিত্র

রোশনি, শুনে যা ১৬

মালতী-পুঁথি : পাণ্ডুলিপিচিত্র

সংসারের পথে পথে, মরীচিকা অন্বেষিয়া ১৬৮

সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে ১৭০

কাছে থাকি, দূরে থাকি ১৯৬

ভূমিকা

বার্ষিক রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

এই খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ মালঞ্চ নাটক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মালঞ্চ উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, এবং তা পাণ্ডুলিপি আকারেই বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ছিল। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে ঐ খণ্ডের সম্পাদক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় পরবর্তী খণ্ডে এই নাট্যরূপ প্রকাশের বিষয়টি উত্থাপন করেন, এবং আমার পূর্বতন উপাচার্য ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় তা সমর্থন করেন। তদনুসারে বর্তমান খণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়। আশা করা যায় যে, রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের কাছে এটি আদরণীয় হবে।

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত মালতী-পুঁথির পরিশিষ্টাংশ এই খণ্ডে সংযোজিত হল।

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনের সাহিত্যচিন্তা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দিয়ে আনুকূল্য করেছেন।

শান্তিনিকেতন
২২ অক্টোবর ১৯৬৮

মালঞ্চ

নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত মালঞ্চ উপন্যাসের নাট্যরূপ অবলম্বনে মুদ্রিত। কপির পৃষ্ঠাঙ্ক বন্ধনীভুক্ত পাইকা অক্ষরে এবং টীকায় সংকেতাঙ্ক বন্ধনীমুক্ত বর্জাইস অক্ষরে নির্দেশিত হয়েছে। লিপিকর-প্রমাদ অথবা কবির অসাবধান-জনিত ভ্রম-গুলির সংশোধিত পাঠ সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধনীভুক্ত করে মুদ্রিত হয়েছে। যে-সকল শব্দের একাধিক বানান গ্রাহ্য— এবং কবির হস্তাক্ষরেই যেগুলির বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়েছে— সেগুলি অবিকল রক্ষিত হল।

মালঞ্চ

[১ম অঙ্ক]

[পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা।

মেঝে সাদা মার্ব্বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই ও দুটি বেতের মোড়া ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই, এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গাছ[১]।

পূবদিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অরকিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি, বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা।] [1]

নীরজা

রোশ্‌নি।

(আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা পাকা চুল। শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ। ঘাঘরার[২] উপর সাড়ি। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গীতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা।)

রোশনি

জল এনে দেব খোঁখি।

নীরজা

না বোস্। (মেঝের উপর আয়া বসল হাঁটু উঁচু করে[৩]।) আজ ভোর বেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম। সরলাকে নিয়ে বুঝি উনি[৪] বাগানে গিয়েছিলেন ?··· আমাকেও তো এমনি করে ভোরে জাগিয়ে বাগানের কাজে রোজ নিয়ে যেতেন,[৫] ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশি দিনের কথা নয়।

রোশনি

এতগুলো মালী মাইনে খাচ্চে তবু ওঁকে নইলে বাগান শুকিয়ে যেত বুঝি[৬]। [?]

নীরজা

নিয়ুমার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান[৭] না পাঠিয়ে আমার [১] একদিনও কাটত না। আজও ফুলের চালান গিয়েছিল। গাড়ির শব্দ শুনেছি[৮]। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি ?

[আয়া কোনো উত্তর করলে না— ঠোঁট চেপে রইল বসে।]

আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।

রোশনি

আর সেদিন নেই। লুঠ চলছে এখন দু-হাতে[৯]।

নীরজা

সত্যি না কি?

রোশনি

আমি কি মিথ্যে বলছি? কলকাতার নতুন বাজারে ক-টা ফুলই বা পৌঁছয়! জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় ফুলের বাজার বসে যায়[১০]।

নীরজা

এরা কেউ দেখে না?

রোশনি

চোখ থাকতেও যদি না দেখে তো কী আর বলব[১১]?

নীরজা

জামাইবাবুকে বলিসনে কেন? [২]

রোশনি

বলব! এত বড়ো বুকের পাটা কার! এখন কি আর সে রাজত্তি আছে? মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি একটু জোর করে বলো না কেন খোঁখী! তোমারি তো সব[১২]!

নীরজা

হোক না, হোক না! বেশ তো! এমনি চলুক না কিছুদিন, যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনিই পড়বে ধরা। তখন বুঝবে মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। ওঁর সরলার চেয়ে বাগানের দরদ কেউ জানে না! চুপ করে থাক্ না, দর্পহারী মধুসূদন আছেন[১৩]।

রোশনি

কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।

নীরজা

আমি মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে ও সইবে কেমন করে? ওদের হোলো সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে। ওকে হুকুম করতে আসে। হলা আমার কাছে নালিশ করেছিল, শুধিয়েছিল এ সব ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে হবে না কি। আমি ওকে বলে দিলুম— [৩]'শুনিস্ কেন? চুপ করে থাক, কিচ্ছু করতে হবে না[১৪]।

রোশনি

সেদিন জামাইবাবু রাগ করে ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বাগানে গোরু ঢুকেছিল।

ঐ যে ইলা চলেছে দাঁতন করতে করতে দীঘির দিকে। ডাক্‌ত ওকে।

আয়া

ইলা, ইলা। (ইলার প্রবেশ)

নীরজা

কীরে, আজকাল নতুন খবর আছে কিছু?

ইলা

আছে, ঐ কি বউদিদি, শুনে তোমার ভুল আসে।

নীরজা

কেমন?

ইলা

পাশে মল্লিকদের বাড়ি আমার হাতে, খুকুর খোকা তারি ইঁট পাটকেল সব গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিচ্ছে। আমি বল্লুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।

নীরজা

ওদের কে বলিস নে কেন?

ইলা

বলেছিলুম। তবু উনি কি বল্লেন, চুপ করে থাক। বৌদিদি আমাকে ছুটি দাও, আমি তো আর এ সইতে পারিনে।

নীরজা

তাই তো দেখছি বটে তুই কাঁদ কাঁদ হয়ে আসছিলি।

ইলা

বৌদিদি, তুমিই তো আমার চিরদিনের মালিক – তোমার চোখের সামনে আমার এত অপমান ঘটতে দেবে?

নীরজা

আচ্ছা যা, ওদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বলবে তখন আমি শাসন করেছি। এখন যা – দাঁড়িয়ে রইলি যে?

ইলা

দেশ থেকে চিঠি এসেছে হালের গোরু একটা মারা গেছে। না কিনলে ... তোমার ...

নীরজা

সব তোর মিথ্যে কথা।

ইলা

মিথ্যে হলেও তো দয়া করতে হয়। ইলা তোমার দুঃখী ...

নীরজা

আচ্ছা সে হবে। রোশনী ...

ইলা

বউয়ের জন্যে একটা তোমার পুরোনো কাপড় – ...

নীরজা

তিনি বললেন "গোরু তাড়াস নে কেন?" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু? গোরুই তো আমাকে তাড়া করে। আমার প্রাণের ভয় নেই[১৫]?"

নীরজা

তা যাই হোক, ও যাই করুক, ও আমার নিজের হাতে তৈরি। ওকে তাড়িয়ে বাগানে নতুন লোক আনলে, সে আমি সইতে পারব না। তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে আমি কি বুঝি নে? ওর যে আগুন জ্বলেছে বুকে।— ঐ যে হলা চলেচে দাঁতন করতে করতে দীঘির দিকে। ডাক্‌ তো ওকে[১৬]।

আয়া [রোশনি]

হলা, হলা[১৭]। (হলধরের প্রবেশ)

নীরজা

কী রে, আজকাল নতুন ফরমাস আছে কিছু?

হলা

আছে বৈ কি বউদিদি, শুনে চোখে জল আসে।

নীরজা

কী রকম?

হলা

পাশে মল্লিকদের বাড়ি ভাঙা হচ্চে, হুকুম হোলো তারি ইঁট পাটকেল সব গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিতে। আমি বল্লুম, রোদের বেলা গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।

নীরজা

বাবুকে বলিস নে কেন?

হলা

বলেছিলুম। বাবু ধমক দিয়ে বল্‌লে, চুপ করে থাক। বৌদিদি [,] আমাকে ছুটি দাও, আমি তো আর এ সইতে পারি নে।

নীরজা

তাই দেখেচি বটে তুই ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।

হলা

বৌদিদি, তুমিই তো আমার চিরদিনের মনিব— তোমার চোখের সামনে আমার এত অপমান ঘটতে দেবে?

নীরজা

আচ্ছা যা, তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বলবে [,] বলিস আমি তোকে বারণ করেচি। এখন যা'— দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

হলা

দেশ থেকে চিঠি এসেছে হালের গোরু একটা মারা গেছে। না কিন্‌তে পারলে চাষ বন্ধ। কাকে জানাব দুঃখ !

নীরজা

সব তোর মিথ্যে কথা।

হলা

মিথ্যে হলেও তো দয়া করতে হয়। হলা তোমার দুঃখী তো বটে।

নীরজা

আচ্ছা সে হবে। রোশনি [,] সরকারবাবুকে বলে দিস ওকে দুটো টাকা দেবে। আবার কী ! যা চলে।

হলা

বউয়ের জন্যে একটা তোমার পুরোনো কাপড়— দেশে পাঠিয়ে দিই জয়জয়কার।

নীরজা

রোসনি, ওকে দে তো ঐ আলনার কাপড়খানা।

রোশনি

সে কি কথা ! ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি।

নীরজা

হোক্ না ঢাকাই সাড়ি ! আমার কিসের দরকার। কবেই বা আর পরব।

রোশনি

সে হবে না খোঁখিঁ [খোঁখি]। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দিয়ে দেব।

হলা

(নীরজার পা ধরে) আমার কপাল ভেঙেচে দিদিমণি [বউদিদি]।

নীরজা

কেন রে ? কী হোলো তোর ?

হলা

আয়াজিকে মাসী বলে এসেচি, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোই বাসেন। আজ দিদিমণি [বউদিদি,] তোমার যদি দয়া হোলো উনি কেন দেন বাগ্‌ড়া ?

[illegible]

সে কি কথা! ওর কোলে [illegible]

নীরজা

হোক না তাহাই সাড়ি! [illegible]

রোশনি

সে হবেনা খোঁখি। ওকে তোমার বেড়ে [illegible]

ইলা

(নীরজার পা ধরে) আমার কোনো দোষ [illegible]।

নীরজা

কেন রে? কী হোলো তোর?

ইলা

[illegible] মাসী বলে এসেছি, এতদিন ধরে তো তোমরা ইলাকে আপনারই ভালোবাসেন। [illegible] দিদিমনি তোমার পা ছুঁয়ে বলো উনি কেন কেন এলো? আমার যদি [illegible] না হবে তবে [illegible] ইলাকে [illegible] হাতে দিলে তুমি আর বিছানায় পড়ে।

নীরজা

[illegible] তোর মাসী তোকে ভালোই বাসে — এইমাত্র তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দিলে যাও ওকে [illegible], নইলে ও ধুলোয় দিলে পড়ে থাকবে।

(আয়া প্রসন্ন মুখে কাগজটা ফেলে দিলে ওর সামনে। ইলা সেটা তুলে নিয়েই প্রণাম করে বললে) এই কাগজটা দিলে মুক্তি দিই দিদিমনি, নইলে দাগ লাগবে। (কোনোকিছুর অপেক্ষা না রেখে তোরঙ্গে দিয়ে মুড়ে দিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান)

নীরজা

আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন? (দৃশ্য দুই)

আমার যদি এমন দশা না হবে তবে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় পড়ে। [!]

নীরজা

না রে, তোর মাসী তোকে ভালোই বাসে— এইমাত্র তোর গুণগান করছিল। রোস্‌নি, দিয়ে দাও ওকে কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাক্‌বে।

(আয়া অপ্রসন্ন মুখে কাপড়টা ফেলে দিলে ওর সাম্‌নে। হলা সেটা তুলে নিয়েই প্রণাম করে বল্‌লে)

[হলা]

এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই দিদিমণি [বউদিদি], নইলে দাগ লাগবে। (সম্মতিব অপেক্ষা না বেখে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে নিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান)

নীবজা

আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেবিয়ে গেছেন ?

বোশনি

নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া! টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।

নীবজা

এমন তো একদিনও হয় নি। সকালবেলায় ফুল একটা দিয়ে যেতেন,— সময় হোলো না। জানি জানি আগেকাব দিনেব আর কিছুই থাকবে না। আমি থাকব পড়ে আমাব সংসাবেব আঁস্তাকুড়ে নিবে যাওয়া উনুনেব পোড়া কয়লা ঝেঁটিয়ে ফেলবার [৭] জায়গায়। সে কোন্ দেবতা এমন বিচার যাব। (সবলা আসচে দেখে আয়া মুখ বাঁকা কবে চলে গেল[১৮])

[সবলাব প্রবেশ। হাতে তাব একটি অবকিড। সবলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা বং। দেখবামাত্র সবচেয়ে লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরেব শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনেব সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে। নীরজা তাব মুখের দিকে তাকালে না। যেন কেউ আসে নি ঘরে। সরলা আস্তে আস্তে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে[১৯]।]

নীরজা

(বিরক্তিতে) কে আনতে বলেছে ?

সরলা

আদিৎদা।

নীরজা

নিজে এলেন না যে। [?]

সরলা

নিয়ুমার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হোলো চা-খাওয়া সেরেই।

নীরজা

এত তাড়া কিসের ? [৫]

সরলা

কাল রাত্রে তালা ভেঙে[২০] টাকা চুরির খবর এসেছে।

নীরজা

টানাটানি করে পাঁচ মিনিটও কি[২১] সময় দিতে পারতেন না ?

সরলা

কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল, ঘুমোতে পার নি। ভোর বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে, দরজা পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন তবে এই ফুলটি তোমাকে দিই যেন[২২]।

নীরজা

(ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে) জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত। [?] পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।··· জানো এ ফুলের নাম ?

সরলা

এমারিলিস।

নীরজা

ভারি তো জানো তুমি। ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।

সরলা

তা হবে। [৬]

নীরজা

তা হবে মানে কী ? নিশ্চয়ই তাই। আমি জানি নে[২৩] ?

[ধীরে ধীরে সরলা প্রস্থানোদ্যত—]

শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে ?

সরলা

অরকিডের ঘরে।

নীরজা

অরকিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।

সরলা

পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্য আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।

নীরজা

আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না ?···দাও বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।

সরলা

(জানালা বন্ধ করে দিয়ে) এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি। [৭]

নীরজা

না, কিছু আনতে হবে না। এখন যেতে পারো।

সরলা

মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।

নীরজা

না দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাস আছে নাকি ?

সরলা

গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।

নীরজা

তার সময় এই বুঝি। এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে, শুনি।

সরলা

মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।

নীরজা

বারণ করেছিলে বুঝি ? আচ্ছা আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।

[হলা মালীকে সরলা ডেকে আনল]

(হলা মালীর প্রতি) বাবু হয়ে উঠেছ ? গোলাপের ডাল [৮] পুঁততে হাতে খিল ধরে, দিদিমণি তোমার এসিষ্টেন্ট মালী না কি ? বাবু সহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি ; আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্চি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।

[শ্রান্তিতে নীরজা বালিশে মাথা এলিয়ে চুপ করে পড়ে রইল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে সরলার প্রস্থান]

হলা

দিদিমণি [বউদিদি], একটা পিতলের ঘটি। কটকের তৈরি[২৪]। এ জিনিষের দরদ তুমিই বুঝবে, তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।

নীরজা

এর দাম কত হবে[২৫] ?

হলা

(জিভ কেটে) এমন কথা বোলো না। ঐ ঘটির দাম নেব ? তোমার খেয়ে পরেই মানুষ[২৬] ! (ঘটি টেবিলে রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিলে। যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে) আমার ভাগনীর বিয়েতে সেই বাজুবন্ধের কথাটা ভুলো না দিদিমণি [বউদিদি]। পিতলের জিনিষ যদি দিই তাতে তোমারি নিন্দে হবে[২৭]।

নীরজা

আচ্ছা আচ্ছা [,] স্যাকরাকে ফরমাস দেব, তুই এখন যা[২৮]।

প্রস্থান [হলার প্রস্থান]

২য় দৃশ্য

[নীরজা শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। তার খুড়তুতো দেওর রমেনের প্রবেশ]

রমেন

বৌদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।

নীরজা

(হেসে) খবর দেবার ছুতো করে এক দৌড়ে ছুটে এসেছ, ঠাকুরপো। কেন, আপিসের বেহারাটা মরেচে বুঝি ?

রমেন

তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বৌদি ? বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূতপদের দরদ।

নীরজা

ওগো মিষ্টি ছড়াচ্চ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে ? তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবু কুঞ্জবনে। দেখো গে যাও। [৯]

হলা

দিদিমণি, এনেছি পিতলের ঘটি। চীনেদের তৈরি। এ বিলিতি ফুল ঢুকবে, তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।

নীরজা

এর দাম কত হবে?

হলা

(জিভ কেটে) এমন কথা বোলো না। ঐ ঘটির দাম নেব? তোমার খেয়ে পরেই মানুষ! (ঘটি টেবিলে রেখে এবং ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে) আমার ভাগনীর বিয়েতে সেই [illegible] খুশি হয়ে দিতে [illegible] দিদিমণি। পিতলের কলসি যদি দিই তাতে তোমারই দিতে হবে। ~~[illegible]~~

নীরজা

আচ্ছা আচ্ছা সরকারকে বোলে দেব, [illegible] তুই এখন যা।

প্রস্থান

রমেন

কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তারপরে যাব মালিনীর সন্ধানে।

[এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দান]

নীরজা

"অশ্রুশিকল",—এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বলো তোমার কল্পনার দোসর [,] তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী। কী সোহাগ গো।

রমেন

আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।

সরলা [নীরজা]

কী কথা?

রমেন

সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে?

সরলা [নীরজা]

কেন বলো তো।

রমেন

দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের [১০] তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো-মন নয়। এমন বেকার দশা, আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম 'মন কোনদিকে।' ও বললে—'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।' আমি বললুম—'ওটা হোলো হেঁয়ালি, স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বল্‌লে,—'সব কথারই কি ভাষা আছে[২৯]?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন'।

নীরজা

হয়তো তোমার দাদার বচন।

রমেন

হতেই পারে না।

নীরজা

কেন হতেই পারে না[৩০]।

রমেন

দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুঙ্কার দিতে পারে, কিন্তু 'পুষ্পরাশা-বিবাগ্নিঃ'—এও কি সম্ভব হয়?

নীরজা

আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য। [১১]

রমেন

পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলচি তোমার কাছে হলফ করে।

নীরজা

তা হলে বাধাটা কোথায়? ওর কি মন নেই?

রমেন

সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেছিই তো[৩১] ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।

নীরজা

(হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে রমেনের হাত চেপে ধরে) কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।

রমেন

(বিস্মিতভাবে নীরজার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে) বৌদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তারপরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।

নীরজা

আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্চি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুনমাসে [১২] ভাল দিন আছে।

রমেন

আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে, ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল্ নেই।

নীরজা

এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?

রমেন

না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদীগমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।

[হরলিক্স্ দুধের পাত্রটা টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল]

নীরজা।

দেখো না, শোনো না সরলা, এই দেয়ালে আঁকা ছবি, চিনতে পারো?

সরলা

ও তো আমার!

নীরজা

তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। তখন তোমার কাকা মেসোমশায়ের ওখানে তোমরা বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হয় যেন স্কুল পালানো হবে। মারাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।

সরলা

এ তুমি কোথায় থেকে পেলে?

নীরজা

আমি জানতুম ওঁর একটা ডেস্কের মধ্যে ছিল সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি, ঠাকুরপো তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন অনেক অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।

রমেন

তখনকার সরলাকে জানতুম না তাই আমার কাছে এখনকার সরলাই [illegible]।

নীরজা

ওর এখনকার চেহারায় হৃদয়ের কোন একটা রহস্য ফুটে উঠেছে — [illegible] সাদা ওর ভিতর থেকে প্রাণের জল আস্ত [illegible] [illegible] রোম্যান্টিক ভালো না ঠাকুরপো!

(সরলার প্রস্থানোদ্যম)

নীরজা

সরলা, একটু বোসো। — ঠাকুরপোর [illegible] [illegible]

ফেলে দিই। ওর কী সকলের আগে তোমাদের [illegible]

নীরজা

যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার, চিন্‌তে পারো ?

সরলা

ও তো আমার।

নীরজা

তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জ্যাঠামশায়ের ওখানে তোমরা বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্চে বয়েস পনেরো হবে[৩২]। মারাঠি মেয়ের মতো মালকোচা [মালকোঁচা] দিয়ে সাড়ি পরেচ।

সরলা

এ তুমি কোথা থেকে পেলে ?

নীরজা

আমি জানতুম ওঁর একটা ডেস্কের মধ্যে ছিল [,] সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি[৩৩]। ঠাকুরপো [,] তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখ্‌তে হয়েচে। তোমার কী মনে হয়।

রমেন

তখনকার সরলাকে জানতুম না তাই আমার কাছে এখনকার সরলাই সত্য[৩৪]।

নীরজা

ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোন্ একটা রহস্যে ভরে উঠেচে—যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি ঝরি করচে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক বলো [,] না ঠাকুরপো!

(সরলার প্রস্থানোদ্যম)

নীরজা

সরলা, একটু রোসো।—ঠাকুরপো [,] একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে তোমাদের চোখে পড়ে বলো দেখি[৩৫]! [১৩]

রমেন

সমস্তটাই একসঙ্গে।

নীরজা

নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো, কেমন একরকম মিষ্টি করে চাইতে জানে[৩৬]। না, উঠো না সরলা। আর একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।

রমেন

তুমি কি ওকে নীলেম করতে বসেছ না কি বৌদি? জানোই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।

নীরজা

ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?

রমেন

(হেসে) আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।

নীরজা

অমন দুটি হাতের পরে দাবী করবে না? [১৪]

রমেন

চিরদিনের দাবী নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবী করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

[সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে—]

একটা কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব।

সরলা

কী বলো।

রমেন

আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা [,—]এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে বসে[৩১] মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।

সরলা

আচ্ছা [,] এসো তুমি। [১৫]

রমেন

(খাটের কাছে ফিরে এসে) তবে আসি বৌদি।

নীরজা

আর থাকবার দরকার কী? বৌদির যে কাজটুকু ছিল সে তো সারা হোলো।

[সরলা ও রমেনের প্রস্থান]

নীরজা

রোশনি, শুনে যা।[৩৮] (রোশনির প্রবেশ)

রোশনি

কী খোঁখী [।]

নীরজা

তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত রংমহলের রঙ্গিনী। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রং তো এখনো ফিকে হয় নি কিন্তু সেই রংমহল! [১৬]

রোশনি

যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

নীরজা

রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত রাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমতে [ঘুমোতে] পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।

রোশনি

একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।

নীরজা

আচ্ছা [,] ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে ?

রোশনি

ভোর বেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায় ?

নীরজা

মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্চে। তা হলে ওদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই ? [১৭]

রোশনি

তুমি নেই এখন ওদের গায় হাত দেয় কার সাধ্যি।

নীরজা

ঐ না শুনলেম শব্দ।

রোশনি

হাঁ, বাবুর গাড়ী এল।

নীরজা

হাত [-] আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানী থেকে, সেফটি পিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।

রোশনি

যাচ্চি কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও, লক্ষ্মী তুমি।

নীরজা

থাক পড়ে, খাব না।

রোশনি

দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।

নীরজা

তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।

[আয়ার প্রস্থান] [১৮]

[ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। দূরে ঝিলের জল টলমল করছে, জানলা দিয়ে তার কিছুটা দেখা যাচ্চে, নীরজা সে দিকে চেয়ে আছে[৩৯]। দ্রুত পদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাতজোড়া বাসন্তী রংএর দেশী ল্যাবার্ণাম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে—]

আদিত্য

আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।

[নীরজা আর থাকতে পারল না [,] ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরে ললাটের চুলগুলো সীঁথিতে পাট করে তুলে দিতে দিতে বললে[৪০]—]

আদিত্য

মনে মনে তুমি নিশ্চয় জানো আমার দোষ ছিল না।

নীরজা

অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো? আমার কি আর সেদিন আছে? [১৯]

আদিত্য

দিনের কথা হিসেব করে কী হবে? তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।

নীরজা

আজ যে আমার সকল তাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।

আদিত্য

অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।

নীরজা

আর ভুলে যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ। নয়?

রোশনি, শুনে যা।

কী খোঁকী।

ওদের মালীদের একদিন আমাকে ডাকতো সেই
ফুলবাগানের রানী। [illegible] আমাদের দিন হয়েছে,
[illegible]

[illegible] তুমি
[illegible]

[illegible] এমন করে
[illegible] সেই জায়গায়
আর এই [illegible] কিন্তু
[illegible]

[illegible] আমার আসতো।

আচ্ছা ওরা কি তোমাকে রেখেছে, জেনেছো?

[illegible]

কেমনে জানবে? [illegible]?

মালীদের [illegible] ভাবলি?

[illegible] তুমি [illegible] ইচ্ছে করেছে।

তুমি সেই [illegible] পায়ে হাত দিয়ে

বসে আছি।

এ না তুমি [illegible]?

হাঁ [illegible]।

হাত আমার [illegible] দে।

[illegible] নিয়ে [illegible] থেকে,
দেখো! [illegible] আমার [illegible] হয়ে গেছে। যা
দূরে [illegible] থেকে।

[illegible] কিন্তু তুমি [illegible] আছে
[illegible] ছিলে তুমি।

[illegible] না। [illegible]
আমার আর [illegible] হয় নি।

ওর [illegible] হবে না, তুই যা চলে যা।
ঐ [illegible] খুলে দিয়ে যা।
আমার [illegible]।

আদিত্য

ভুলতে ফুরসৎ দাও কই !

নীরজা

বোলো না, বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে।

আদিত্য

উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়। [২০]

নীরজা

সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি ?

আদিত্য

কী কথা বলো তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।

নীরজা

কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা দুটো বিছানায় তোলো।

আদিত্য

বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই ?

নীরজা

হাঁ বেড়ি দিতেই চাই[৪১]। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।

আদিত্য

মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।

নীরজা

না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে ? তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার। [২১]

আদিত্য

আমি তা হলে তোমাকেই সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।

নীরজা

তা কোরো [,] কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।

আদিত্য

যাই বলো আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার পরে !

নীরজা

কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমাকে দিতে হবে না।—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।

আদিত্য

দণ্ড কিসের জন্য ? রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।

নীরজা

যদি কোনও দিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।

আদিত্য

অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে [২২] অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।

[আয়া এল ঘরে]

রোশনি

জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।

[বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল]

আদিত্য

(দাঁড়িয়ে উঠে) এবার তবে আমি রাগ করি।

নীরজা

হাঁ করো, অন্যায় করেছি,[৪২] কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।

আদিত্য

(দরজার কাছে এসে) সরলা ! সরলা !

[সরলা এল ঘরে]

(সরলাকে বিরক্তভাবে) নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি ?

নীরজা

ওকে বক্‌ছ কেন ? ওর দোষ কী ? আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি। আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও। মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে। [২৩]

আদিত্য

যাবে কি, ওষুধ বের করে দিক, হরলিক্স মিল্ক তৈরি করে আনুক।

নীরজা

আহা সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মারো তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন ! একটু দয়া হয় না তোমার মনে ? আয়াকে ডাকো না।

আদিত্য

আয়া কি ঠিকমত পারবে এ সব কাজ।

নীরজা

ভারী তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।

আদিত্য

কিন্তু—

নীরজা

কিন্তু আবার কিসের। আয়া! আয়া!

আদিত্য

অতো উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটবে দেখছি।

সরলা

আমি আয়াকে ডেকে দিচ্চি।

(সরলা চলে গেল) [২৪]

[আয়া এসে ওষুধ পথ্য করাল]

আদিত্য

(আয়াকে) সরলাদিদিকে ডেকে দাও।

নীরজা

কথায় কথায় কেবলি সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।

আদিত্য

কাজের কথা আছে।

নীরজা

থাক না এখন কাজের কথা।

আদিত্য

বেশিক্ষণ লাগবে না।

নীরজা

সরলা মেয়েমানুষ [,] ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের? তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো না।

আদিত্য

তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষরা হাড়ে অকোজো [অকেজো][৪৩]। আমরা কাজ করি, দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ

করো প্রাণের উৎসাহে। [২৫] এই সম্বন্ধে একটা থীসিস্ লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

নীরজা

সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাই তো পোড়ো বাড়ীতে ভূতের বাসা হোলো।

[সরলার প্রবেশ]

আদিত্য

অর্কিড [-] ঘরের কাজ হয়ে গেছে ?

সরলা

হাঁ হয়ে গেছে।

আদিত্য

সবগুলো ?

সরলা

সবগুলোই।

আদিত্য

আর গোলাপের কাটিং।

সরলা

মালী তার জমি তৈরি করছে [।] [২৬]

আদিত্য

জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতনকাঠির চাষ হবে আর কি।

নীরজা

সরলা, যাও তো, কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।

[সরলা মাথা হেট [হেঁট] করে বেরিয়ে গেল]

(আদিত্যকে) আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম ?

আদিত্য

হাঁ উঠেছিলুম।

নীরজা

ঘড়িতে তেমনি এলার্‌মের দম দেওয়া ছিল ?

আদিত্য

ছিল বৈ কি।

নীরজা

সেই নীম গাছতলায় সেই কাঁটাগাছের গুঁড়ি[২৪]। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাস্থ ? [২৭]

আদিত্য

রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবীতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।

নীরজা

দুটো চৌকিই পাতা ছিল ?

আদিত্য

পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল [-] পাড় [-] দেওয়া বাসন্তী রংএর চায়ের সরঞ্জাম, দুধের জাগ রূপের [রূপোর], ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন [-] আঁকা জাপানী ট্রে।

নীরজা

অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন ?

আদিত্য

ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোণাগুণতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।

নীরজা

সরলাকে কেন ডাকো না তোমার চায়ের টেবিলে ? [২৮]

আদিত্য

সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।

নীরজা

চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড [-] ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে ?

আদিত্য

হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।

নীরজা

আচ্ছা [,] একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন ?

আদিত্য

ঘটকালি কি আমার ব্যবসা ?

নীরজা

না ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায় ?

আদিত্য

পাত্র আছে একদিকে [,] পাত্রী আছে আর একদিকে,[৪৫] মাঝখানটাতে [২৯] মন আছে কিনা সে খবর নেবার ফুরসৎ পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।

নীরজা

কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।

আদিত্য

বিয়ে করবে অন্যপক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে ? তুমি চেষ্টা দেখো না।

নীরজা

কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।

আদিত্য

শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড় [-] পর্ব্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রেজ[৪৬] আর কি।

নীরজা

মিছে বক্‌চ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।

আদিত্য

এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ-লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কি ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল না কি ? [৩০]

নীরজা

(রুক্ষভাবে) কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে তত ব্যস্ত হতে হবে না। [আদিত্য ওঠবার উপক্রম করছে]…আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিডঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা ? তারপরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না ?

আদিত্য

(বিস্মিত ভাবে) সে কেমন কথা ? নষ্ট হতে দেবার সখ আমার দেখলে কোথায় ?

সরলা [নীরজা]

(উত্তেজিত হয়ে) সরলা কী জানে ফুলের বাগানের ?

আদিত্য

বলো কী ? সরলা জানে না ? যে [-] মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ তিনি যে সরলার জ্যাঠামশায়। তুমি তো জানো তাঁরি বাগানে আমার হাতে [-] খড়ি। জ্যাঠামশায় বলতেন ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরি, আর গোরু দোওয়ানো। তার [তাঁর] সব কাজে ও ছিল তার [তাঁর] সঙ্গিনী। [৩১]

নীরজা

আর তুমি ছিলে সঙ্গী।

আদিত্য

ছিলেম বৈ কি। কিন্তু আমাকে করতে হোত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।

নীরজা

সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, এমনি ও মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলন। মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।

আদিত্য

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু ? কী কথা বল্‌ছ ? মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন [৩২] আমি কি জানতুম তখনি তাঁর তহবিল ডুবুডুবু[৪৭]। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।

[সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল]

[নীরজা]

(সরলাকে) ঐখানে রেখে যাও। [রেখে সরলা চলে গেল]

(আদিত্যকে) সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন ?

আদিত্য

শোনো একবার কথা। বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।

নীরজা

মনেও আসে নি ? এই বুঝি তোমার কবিত্ব।

আদিত্য

জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনো মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়, নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তাহলে কী হত বলা যায় না।

নীরজা

কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী? [৩৩]

আদিত্য

এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্র হরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্ব্বেই জানিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে[৪৮]। গন্ধের ইসারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।

নীরজা

সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।

আদিত্য

সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।

নীরজা

আচ্ছা সত্যি বলো। ওকে তুমি ভালোবাসতে না?

আদিত্য

নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড়পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারী [করে], তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন কি তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তারপরে তিনি চলে গেলেন। অনাথা হোলো সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি [৩৪] গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখো নি কি তুমি? ও যে ভালোবাসার জিনিষ,[৪৯] ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুসি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হোতো যেন পাখীর ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি আমারো কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।

নীরজা

থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে; আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে [-] স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।

আদিত্য

বারাসতের মেয়ে ইস্কুল ? কেন আণ্ডামানও তো আছে ?

নীরজা

না ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ঐ অর্কিড [-] ঘরের কাজ দিতে পারবে না।

আদিত্য

কেন হয়েছে কী ? [৩৫]

নীরজা

আমি তোমাকে বলে দিচ্চি সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।

আদিত্য

আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান সখ ছিল অরকিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস দ্বীপ থেকে, জাভা থেকে [,] এমন কি চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন কেউ ছিল না।[৫০]

নীরজা

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে এমন কি তোমার চেয়েও। তা হোক্, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু কেবল তোমার আমার,[৫১] ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়, কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ করা। এতকাল পরে অন্ততঃ এইটুকু দাবী করতে পারি। কপাল [-] দোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে—।

[কথা শেষ করতে পারল না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল] [৩৬]

আদিত্য

[আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে বসে ভাবতে লাগলে,—কিছুক্ষণ পরে নীরজার হাত ধরে বললে—]
কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি ?

নীরজা

(হাত ছিনিয়ে নিয়ে) কিচ্ছু চাই নে, কিচ্ছু না ;[৫২] ও তোমারি বাগান, তুমি যাকে খুসি রাখতে পারো আমার তাতে কী ?

আদিত্য

নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান ? তোমার নয় ? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে ?

নীরজা

যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত [-] কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য্য সরলার সামনে! আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?

আদিত্য

নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে [৩৭] বাতাবী নেবুর সঙ্গে কলম্বা নেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্যে।

নীরজা

তখন তো ওর এত গুমোর[৫৩] ছিল না। বিধাতা যে আমারি দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়েছে[৫৪] ও এত জানে ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এসব কথা কোনও দিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন তুলনা করতে এলে[৫৫]? আর আমি ওর সঙ্গে পারব কেন? মাপে সমান হব কী নিয়ে?

আদিত্য

নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্চে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।

নীরজা

না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এতদিনেও তুমি বুঝলে না এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি [৩৮] একটুও[৫৬]। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত। ওকে সইতে পারতুম না। ও হোতো আমার সতীন। তুমি তো জানো আমার দিনরাতের সাধনা। জানো কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।

আদিত্য

জানি বই কি। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।

নীরজা

ওসব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর [-] একজন, কোথাও একটুকু ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা

কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার বাগান কি আমার দেহ নয়? আমি হলে কি এমন করতে পারতুম?

আদিত্য

কী করতে তুমি?

নীরজা

বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয় তো। ব্যবসা হোতো দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী [৩৯] রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে। বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমোর আছে সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহঙ্কার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার। এমনটা কেন হতে পারল বলব?

আদিত্য

বলো।

নীরজা

তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাসো বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।

[আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল]

আদিত্য

(বিহ্বল কণ্ঠে) নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ। সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পারো তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্ণারীর পাশে যে জাপানী ঘর আছে সেইখানে থাকব; যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।

[আদিত্য চলে গেল, নীরজা সেদিকে রইল চেয়ে] [৪০]

২য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[দীঘির ওপারের পাড়িতে চাল্‌তা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচিপাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের [মতো] রাঙা[৩১]। জোনাকীর দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান [-] বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন। সরলার পিছন দিকে এসে রমেন বললে—]

রমেন

আসতে পারি কি ?

সরলা

এসো। [রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির ওপর, পায়ের কাছে] (ব্যস্ত হয়ে) কোথায় বসলে রমেন দাদা, উপরে এসো।

রমেন

জানো, দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে। পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা সুরু করি বিলিতি মতে। [সরলার হাতখানি নিয়ে চুম্বন করলে] সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো। [উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে]

সরলা

এ আবার কী ? [৪১]

রমেন

জানো না আজ দোলপূর্ণিমা ? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রংটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে ; নইলে [,] বনলক্ষ্মী [,] অশোকবনে তুমি নির্ব্বাসিত হয়ে থাকবে।

সরলা

তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদী নেই আমার।

রমেন

কথার দরকার কিসের। পুরুষপাখীই গান করে, তোমরা মেয়েপাখী চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হোলো। এইবার বসতে দাও পাশে।

[পাশে এসে বসলে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলে দুই জনেই]

সরলা

রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।

রমেন

জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শ ই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিঁকতে দিল না। [৪২]

সরলা

না আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।

রমেন

ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।

সরলা

বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে যদি আদিৎদার মুখখানা দেখতে পেতে।

রমেন

আভাসে কিছু দেখেছি।

সরলা

আজ বিকেল বেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে, রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিৎদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্য মনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্চে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হোলো আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ [৪৩] দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনি হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'ক্যাটালগ দেখছ বুঝি?' আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন, কিছু যে দেখলেন তা মনে হোলো না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনি কী একটা বলাই চাই। আবার তখনি পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, "দেখেছ সরি, কত বড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম।" কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তারপর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম [,] 'যাবে না

বাগানে ?' আদিৎদা বললেন, 'না ভাই বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে।' বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

রমেন

আদিৎদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন, কী আন্দাজ করো তুমি। [৪৪]

সরলা

বলতে এসেছিলেন [,] তোমার এক বাগান ভেঙেছে, এবার হুকুম এল তোমার কপালে আর এক বাগান ভাঙবে।[৫৮]

রমেন

তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।

সরলা

(ম্লান হেসে) তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি ? সম্রাট বাহাদুর স্বয়ং খোলাসা রাখবেন।[৫৯]

রমেন

তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝঙ্কার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে ? এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।

সরলা

কী করবে তুমি ?

রমেন

তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্ঠি থেকে তাকে তাড়াব। তারপরে লম্বা ছুটি পাব, এমন কি কালাপানির পার পর্যান্ত। [৪৫]

সরলা

তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে[৬০] কিছুদিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।

রমেন

না বললে মনে কোরব।

সরলা

ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি, ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাই [-] এর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে, জেঠামশাই-এর মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে

বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ করে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিৎদা [,] আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জানো কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে। [৪৬]

রমেন

সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।

সরলা

তারপরে জানো হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে [,] তখন আর একবার আদিৎদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই, আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তারপর থেকে আদিৎদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সঙ্কোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন মিললুম[১], সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।

রমেন

কথাটা শেষ করে ফেলো।

সরলা

হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় [৪৭] সব জানো রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বৌদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বৌদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি?

রমেন

তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।

সরলা

আমি কী করব বলো? নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে? [বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে। রমেন চুপ করে রইল] যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।

রমেন

অন্যায় কার উপরে ?

সরলা

বৌদির উপরে।

রমেন

দেখো সরলা [,] আমি মানি নে ওসব পুঁথির কথা। দাবীর [৪৮] হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে ? তোমাদের মিলন কত কালের ; তখন কোথায় ছিল বৌদি ?

সরলা

কী বলছ রমেনদা ! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা ? আদিৎদার কথাও তো ভাবতে হবে।

রমেন

হবে বৈ কি। তুমি কি ভাবছ যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে সেই আঘাতটাই তাঁকেও লাগে নি ?

[পিছন হতে আদিত্যের প্রবেশ]

আদিত্য

(পেছন থেকে) রমেন না কি ?

রমেন

হাঁ দাদা। (রমেন উঠে পড়ল) .

আদিত্য

তোমার বৌদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।

[রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে]

আদিত্য

যেয়ো না সরি, একটু বোসো।···আমরা দুজনে এ সংসারে [৪৯] জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে, এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি ?

সরলা

অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিৎদা।

আদিত্য

সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে

যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জানো, কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের পরে?

সরলা

জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।

আদিত্য

সইতে পারবে সরি?

সরলা

সইতেই হবে। [৫০]

আদিত্য

মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি [,] তাই ভাবি।

সরলা

তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য্য এ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।

আদিত্য

তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না [,] দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়। [বলে উত্তেজনায় হাতের মুঠি শক্ত করলে। সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে—]

সরলা

ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব? [৫১]

আদিত্য

তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্ব্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হোলো তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধ হাত খানেক কেটে দিলেম। তখনি জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে—'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?' বলে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্য্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচকচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য্য। বললেন 'এ কী কাণ্ড।' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে

নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারি তো জ্যাঠামশায়।

সরলা

(হেসে) তোমার যেমন বুদ্ধি, তুমি ভাবছ এটা [৫২] আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।

আদিত্য

খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর [-] একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে--

সরলা

থাক [,] আর বলতে হবে না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) সে [-] সব দিন আর আসবে না। (তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল)

আদিত্য

(ব্যাকুলভাবে সরলার হাত চেপে ধরে) না, যেয়ো না, এখনি যেয়ো না। কখন এক [-] সময়ে যাবার দিন আসবে তখন—(বলতে বলতে উত্তেজিতভাবে—) কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেচে। ঈষ্যা [ঈর্ষ্যা]? আজ দশ বৎসর সংসার [-] যাত্রায় [৫৩] আমার পরীক্ষা হোলো তারি এই পরিণাম। [?] কী নিয়ে ঈর্ষ্যা? তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।

সরলা

তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষ্যার কি কোনো কারণই ঘটে নি? সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।

[আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পরে বলে উঠল—]

আদিত্য

অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি, তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

সরলা

কথা বোলো না আদিৎদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।

আদিত্য

ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে [৫৪] যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনও রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে? তোমার কথা বলতে পারি নে, সরি, আমার তো সাধ্য নেই।

সরলা

পায়ে পড়ি [,] দুর্ব্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।

আদিত্য

(সরলার দুই হাত চেপে ধরে) উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি, এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম্ম।

সরলা

চুপ, চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।

আদিত্য

সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত [৫৫] আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ? কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে? তুমি তো করো নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে সে তো আমি জানি।"

সরলা

জ্যাঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে [,] নইলে হয় তো—

আদিত্য

না না [—] তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি? আমাদের পথ কেন হোলো আলাদা?

সরলা

থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে? কী হবে মিথ্যে ছটফট করে? কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।

আদিত্য

আচ্ছা চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে। [৫৬] [কোমরে বাঁধা ঝুলি থেকে বের করলে পাঁচটি নাগেশ্বর ফুলের একটি ছোটো তোড়া][৬২] আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটি পিন।

(সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে যথাস্থানে তোড়াটি পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল)—কী আশ্চর্য্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য্য! (সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না। যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করিয়ে [করে] দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদীর পরে।)

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর

খাবার এসেছে।

আদিত্য

আজ আমি খাব না। [৫৭]

২য় দৃশ্য

[নীরজার ঘর। ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা। জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে [,] আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্ণম গুচ্ছের উপর। বাকী সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্দ্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানালার বাইরে। সেদিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্চে সুপুরিগাছের সার। এই মাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো। মেঝের উপর পড়ে আছে মালাই [থালায়] বরফি আর কিছু আবির। দরজার কাছ থেকে রমেন জিজ্ঞাসা করল—]

রমেন

বৌদি, ডেকেছ কি?

নীরজা

(রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে) এসো।

[রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। নীরজা অনেকক্ষণ কোনো কথা বল্‌লে

না। তাঁর [তার] ঠোঁট কাঁপতে লাগল যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্ণম গুচ্ছের তুটো খসে [-] পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে [৫৮] একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে[৬৩]। রমেন পত্রখানি পড়তে লাগল—]

—"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হোলো তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার তুর্ব্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্ত্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো যে পর্য্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই এই তোমার ইচ্ছা। হয় তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জ্যাঠা-মশায়ের প্রসাদে। আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্ব্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়ী সুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। [৫৯] এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ী বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জ্যাঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনা সুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ সুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, তুর্লভ ফুলের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এত বড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন আজ ত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়ায় কেরানীগিরি করতে হোতো, তোমার সঙ্গে বিবাহ ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার হয়েছে,[৬৪] আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না, আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা। এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলুম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবীরও [৬০] অন্ত থাকবে না আমার পরে।

তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা [,] যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত। [”]

[চিঠি পড়া শেষ হোলে রমেন চুপ করে রইল]

নীরজা

(ব্যাকুলভাবে) কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।

[রমেন নিরুত্তর ; নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বল্‌লে] অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে ?

রমেন

কী করছ বৌদি, শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।

নীরজা

এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে। ওর জন্য মমতা [৬১] কিসের ? তাঁর পরে আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে ? এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন ‘বনলক্ষ্মী’। আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন ? আমার কি একটা নাম ছিল[৬৫] ? কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হোতো আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন ‘অন্নপূর্ণা’। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দীঘির ঘাটে, ছোটো রূপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতাম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, ‘তাম্বল [তাম্বূল] করঙ্কবাহিনী।’ সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন, ‘গৃহসচিব’ কখনো বা ‘হোম সেক্রেটারি’। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে। সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।

রমেন

বৌদি [,] আবার তুমি সেরে উঠবে—তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে। [৬২]

নীরজা

মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে [।] সেই জন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরছে আমার এই কাঙাল নৈরাশ্য।[৬৬]

রমেন

দরকার কী বৌদি। আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি? যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়? যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হোলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন? এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।

নীরজা

বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো [,] বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে পিছনে ফেলে রেখে হাসি মুখে চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম্ করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে [৬৩] করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।

রমেন

সত্যি কথা বলব বৌদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না [,] তাও প্রসন্নমনে দান করতে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি তোমার সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।

(ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না। কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল [।])

নীরজা

আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো। [৬৪]

রমেন

হুকুম করো বৌদি।

নীরজা

বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন ছোটো[৩৭]। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হোলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে-সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের

হাওয়ায় যুগ যুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে, তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।

রমেন

তুমি তো জানো বৌদি [,] শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে [,] এ বাঁধন বেমেয়াদি।

নীরজা

ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে [৬৫] বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।

রমেন

বৌদি [,] একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্চে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার, 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্ম্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি।' তা হোলে সব ভার যাবে এক মুহূর্ত্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই ; এখনি বলো—'দিলেম দিলেম, কিছুতেই হাত রাখলেম না,[৩৮] আমার সব কিছু দিলেম। নির্ম্মুক্ত হয়ে নির্ম্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে।'

নীরজা

আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বারবার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্য্যন্ত যা কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার, আর দেরি নয় [,] এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। [৬৬]

রমেন

আজ নয় বৌদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সঙ্কল্প।

নীরজা

না না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানী ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন, এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না, এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।

রমেন

সময় হয় নি বৌদি, আজ থাক।

নীরজা

সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষণি ডেকে আনো। (পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু [-] হাত জোড় করে) বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চ্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো [,] একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না। [৬৭]

রমেন

কী বলো।

নীরজা

একবার আমাকে ঠাকর [ঠাকুর-] ঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হোলে আমি বল পাব। কোনো ভয় থাকবে না।

রমেন

আচ্ছা, যাও [,] আপত্তি করব না।

নীরজা

আয়া,

[আয়ার প্রবেশ]

রোশনি

কী খোঁখী।

নীরজা

ঠাকুরঘরে নিয়ে চল আমাকে।

রোশনি

সে কী কথা! ডাক্তারবাবু—

নীরজা

ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না [,] আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে? [৬৮]

রমেন

আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও। ভয় নেই, ভালোই হবে।

[আয়া সহ নীরজার প্রস্থান ; আদিত্যের প্রবেশ]

আদিত্য

এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন?

রমেন

এখুনি আসবেন, তিনি ঠাকুর ঘরে গেছেন।

আদিত্য

ঠাকুর ঘরে ? ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।

রমেন

শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।

আদিত্য

রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জানো আমি জানি।

রমেন

হাঁ জানি।

আদিত্য

আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে। [৬৯]

রমেন

তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হোলো না। বৌদি রয়েছেন ওদিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।

আদিত্য

তোমার বৌদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মানো তো ?

রমেন

মানি বৈ কি।

আদিত্য

সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ ?

রমেন

কে বলে দোষ ?

আদিত্য

আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হোলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব। [৭০]

রমেন

গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন ? বৌদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক-টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো

না। বৌদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারো যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।

[নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বল্‌লে]

নীরজা

মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।

[আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বল্‌লে—]

আদিত্য

নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।

[নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে [৭১] ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললে—]

নীরজা

সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।

আদিত্য

তুমি তো জানো নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে?

নীরজা

এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন? এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে?

আদিত্য

অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।

নীরজা

কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল। ঠাকুরপোকে বলেছিলুম সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন? [৭২]

আদিত্য

রাত হয়েছে [,] এখন থাক []।

নীরজা

ঐ শোনো, আমার মনে হচ্চে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।

[সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে।] এসো বোন আমার কাছে এসো। (সরলার হাত ধরে বিছানায় বসালে। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস্ টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে) একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমি গলায় পরে থাকো, শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতকাল পরেছি[৬৯] সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।

সরলা

অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য। কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ। [৭৩]

আদিত্য

ঐ মালাটা আমাকে দাও না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।

নীরজা

আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনো মতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু, সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

সরলা

ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না। ভালো হবে না তাতে।

নীরজা

সে কী কথা?

সরলা

আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে [৭৪] পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনে বলছি। ভাগ্য যার থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে[৭০], কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম। আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু-বেলা পূজো করেছি। সেও আজ আমার শেষ

হোলো। [এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না। সেও গেল চলে।]

নীরজা

ঠাকুরপো, এ কী হোলো ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো [,] একটা কথা কও।

রমেন

এই জন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।

নীরজা

কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না? [৭৫]

রমেন

বুঝেছে বই কি। বুঝেছে যে মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।

নীরজা

কিছুতে বিশুদ্ধ হোলো না আমার মন। এত মার খেয়েও। কে বিশুদ্ধ করে দেবে? ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি?

রমেন

আমি আছি বৌদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।

নীরজা

ঘুমোব কেমন করে? এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হোলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।

রমেন

চলে উনি যেতে পারবেন না, সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব। [৭৬]

নীরজা

যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।

রমেন

আচ্ছা [,] আচ্ছা [,] আমি যাচ্ছি।

(রমেনের প্রস্থান) [৭৭]

দৃশ্যান্তর

আদিত্য ও সরলা

সরলা

কেন এলে? ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।

আদিত্য

তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, তাতে আমাদের হাত নেই।

সরলা

সে সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও রোগীকে শান্ত করো গে।

আদিত্য

আমাদের এই বাগানের আর একটা শাখা বাড়াব' ' সেই কথাটা— [৭৮]

সরলা

আজ থাক [ ]। আমাকে দু-চারদিন ভাবার সময় দাও। এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।

[রমেনের প্রবেশ]

রমেন

যাও দাদা, বৌদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।

[আদিত্যের প্রস্থান]

সরলা

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?

রমেন

আছে।

সরলা

তুমি যাবে না?

রমেন

যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হোলো না।

সরলা

কেন? [৭৯]

রমেন

সে কথা তোমাকে বলে কী হবে ?

সরলা

তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।

রমেন

যারা আমায় পছন্দ করে না তারা নিন্দে করবে বই কি[১২]।

সরলা

তা হোলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।

রমেন

আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

সরলা

আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।

রমেন

বুঝেছি।

সরলা

পুলিশে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।

রমেন

আচ্ছা, বাধা দেব না। [৮০]

সরলা

এই রইল কথা।

রমেন

রইল।

সরলা

আমরা দুজন এক সঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।

রমেন

হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জ্জনরা তার পরে আমাদের আর এক সঙ্গে থাকতে দেবে না।

[আদিত্যের প্রবেশ]

সরলা

ও কী, এখনি এলে যে বড়ো ?

আদিত্য

দু-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।

রমেন

আমার কাজ আছে—চললুম।

সরলা

(হেসে) বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।

রমেন

কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা। (রমেনের প্রস্থান) [৮১]

সরলা

(আদিত্যের প্রতি) যে সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।

আদিত্য

কিছু বলব না [,] ভয় নেই।

সরলা

আচ্ছা তা হোলে আমিই কিছু বলতে চাই শোনো, বলো কথা রাখবে।

আদিত্য

অরক্ষণীয়া[৭৩] না হোলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জানো।

সরলা

বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুসি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশি দিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে। [৮২]

আদিত্য

আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি ?

সরলা

না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালী ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার ? কক্ষণো না, আমি তোমাকে জানি। (আদিত্যের হাত ধরে) আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক-টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্য। (আদিত্য নিরুত্তর) কথা দাও ভাই।

আদিত্য

দেব কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো রাখবে ?

সরলা

তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয় তো অসম্ভব হবে। [৮৩]

আদিত্য

না, হবে না।

সরলা

আচ্ছা বলো।

আদিত্য

যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে ?

সরলা

জানি নে যে ভাই [,] প্রতিজ্ঞাপালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।

আদিত্য

বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি ? সেই কথাটা বলো আগে।

সরলা

কেন আমাকে দুঃখ দাও ? তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।

আদিত্য

আচ্ছা [,] এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে। [৮৪]

সরলা

আর ফিরে তাকাবে না[৭৪] ?

আদিত্য

না, কিন্তু [···] একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায় ?

সরলা

সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।

আদিত্য

রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে ? সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি ?

সরলা

ভয় নেই তোমার, পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।

আদিত্য

আমি জানতে পারব তো ?

সরলা

নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্চি। কিন্তু ইতিমধ্যে [৮৫] আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।

আদিত্য

তোমারো মন ব্যস্ত হবে না। [?]

সরলা

যদি হয় অন্তয্যামী [অন্তর্য্যামী] ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। [৮৬]

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নীরজার ঘর

নীরজা ও রোশনি

নীরজা

রোশনি।

রোশনি

কী খোঁখী।

নীরজা

কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন ?

রোশনি

সে কী কথা, জান না [,] সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে। [?]

নীরজা

কেন [,] কী করেছিল ?

রোশনি

দারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে[১৫] বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল। [৮৭]

নীরজা

কী করতে ?

রোশনি

মহারাণীর শিলমোহর থাকে যে বাক্সোয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা।

নীরজা

লাভ কী ?

রোশনি

ঐ শোনো, সেটা পেলেই তো সব হোলো। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।

নীরজা

আর ঠাকুরপো ?

রোশনি

সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী [,] একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানি রঙের সাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে 'তোমার ছেলের বৌকে দিয়ো।' [৮৮] চোখে আমার জল এল, কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই সাড়ীটা যদি রেখে দিই কোম্পানী বাহাদুর ধরবে না তো?

নীরজা

ভয় নেই তোর [।] কিন্তু শীগগির যা বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে নিয়ে আয়। (রোশনি কাগজ নিয়ে এল। কাগজ পড়ে নীরজা বললে—) রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্র ঘরের মেয়ে—

রোশনি

মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর ডাকাতের বাড়া। ছি ছি।

নীরজা

ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরী। বেহায়াগিরির একশেষ। বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্য্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।

রোশনি

কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ। [৮৯]

নীরজা

ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে যেন নীচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে। মিথ্যে কথা জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।

[আয়া চলে গেল, পেন্সিল নিয়ে নীরজা একখানা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল]

(গণেশকে) চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?

গণেশ

পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিশের হাত দিয়ে যাবে চিঠিখানা।

নীরজা

(পত্র পাঠ) ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে। [৯০]

গণেশ

ঐ যে পথটার কথা লিখেছ, ভালো শোনাচ্চে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।

[গণেশের প্রস্থান]

(ওষুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আদিত্যের প্রবেশ)

নীরজা

এ আবার কী ?

আদিত্য

ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

(বিছানার পাশে বসল) [৯১]

নীরজা

ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না। না হয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও না, যদি মনে এতই উদ্বেগ থাকে।

আদিত্য

সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন ?

নীরজা

তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো আমি ঢের বেশি খুসি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্চে।

আদিত্য

হোক না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তারপর সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।

নীরজা

সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্চে না। কিন্তু উপায় কী ? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।

আদিত্য

লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে [৯২] তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।

নীরজা

অমন করে আক্ষেপ করছ কেন ? বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্য্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।

আদিত্য

পাখাটা কি চালিয়ে দেব ?

নীরজা

বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনো রকম করে দিন কাটাতে চাও তো তোমাদের তো হর্টিকালচরিস্ট্ ক্লাব আছে।

আদিত্য

তুমি যে রঙীন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজে একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।

নীরজা

কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুক্‌নো [৯৩] সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে শর্ষের [সরষের] খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবী।

আদিত্য

তাই না কি? হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।

নীরজা

বলতে ওর রুচবে কেন? ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ? কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরাণীকে যে [-] রকম গ্রাহ্য করে না সেই রকম আর কি।

আদিত্য

হলা মালী সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।

নীরজা

আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে তুদিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়েরীটা। আমি ম্যাপে পেন্সিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

আদিত্য

আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না? [৯৪]

নীরজা

না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমার ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল্ পামগুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মার্ব্বলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।

আদিত্য

বেদীটা কি ও [-] জায়গায় মানাবে? একটু যেন যাকে বলে শস্তা নবাবী।

নীরজা

চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার [,] সম্পূর্ণ আমার। তারপর সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, [৯৫] আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।

আদিত্য

আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব?

নীরজা

তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আফিসের কাজ তো কম নয়।

আদিত্য

তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হোলে নিষিদ্ধ।

নীরজা

হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই—এখন আমি কেবল আর [-] একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি—তাতে লাভ কী?

আদিত্য

আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে, তখনি আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্য গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না। (বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল) [৯৬]

নীরজা

(আদিত্যের হাত ধরে) না, যেয়ো না [,] একটু বসো। (ফুলদানীতে একটা ফুল দেখিয়ে) জানো এ ফুলের নাম?

আদিত্য

না জানি নে।

নীরজা

আমি জানি। বলব, পেট্যুনিয়া। তুমি মনে করো আমি কিছু জানি নে, মূর্খু আমি।

আদিত্য

(হেসে) সহধর্ম্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্ততঃ আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।

নীরজা

সে [-] কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটচে ও থাকবে দেউঁড়িতে [দেউড়িতে], কিছুদিন পরে আমি থাকব না। ঐ যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্চে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদ্‌যন্ত্রটা। (আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে) একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না? বলো [৯৭] আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি করে।

আদিত্য

যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোয় নি[১৬]।

নীরজা

বলো না তুমি কী মনে করো। একটুও থাকব না? এতটুকুও না?

আদিত্য

এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।

নীরজা

নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব, আর আমিই হব অসম্ভব, এ হোতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো, আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় 'আমি আছি।' মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্চে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো মনে করবে।

আদিত্য

হাঁ মনে করব। (বলল বটে, কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।) [৯৮]

নীরজা

(অস্থির হয়ে) তোমাদের বই যারা লেখে ভারী তো পণ্ডিত তারা। কিছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। এই তোমাকে বলে যাচ্চি, কথা দিয়ে যাচ্চি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব। যেমন আগে দেখতুম

তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না। (শুয়েছিল, উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে) আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হোলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হোলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব? (নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।) আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত [৯৯] বুলোতে লাগল তার মাথায়)

আদিত্য

নীরু [,] শরীর নষ্ট কোরো না।

নীরজা

যাক্ গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে [,] আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর [,] রাগ কোরো না [,] (বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হয়ে—) সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে তার জন্যে আমাকে মাপ করো। কিন্তু আমাকে ভালোবাসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।

আদিত্য

শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ [,] নীরু [,] তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।

নীরজা

শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হোলে নির্ম্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না। [১০০] তা হোলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব [।] (এ কথার কোনো উত্তর না করে [···] মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে—) সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিনই গুণছি''। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের—"এষা" [।] (বালিশের নীচ থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল। শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বললে—)

রোশনি

চিঠি। (আদিত্যের হাতে প্রদান)

নীরজা

ও কী, ও কার চিঠি ?[১৮]

আদিত্য

(একটু চুপ করে থেকে) টেলিগ্রাম এসেছে।

নীরজা

কিসের টেলিগ্রাম ? [১০১]

আদিত্য

মেয়াদ শেষ হবার আগেই সরলা ছাড়া পেয়েছে।

নীরজা

ছাড়া পেয়েছে ? দেখি। (টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে) তা হোলে তো আর দেরি নেই। এখনি আসবে। ওকে নিশ্চয় এনো আমার কাছে [।] (বলতে বলতে মূর্চ্ছার উপক্রম)

আদিত্য

ও কী ! কী হল নীরু ! নার্স [,] ডাক্তার আছেন ?

নার্স (নেপথ্য হতে)

আছেন বাইরের ঘরে।

আদিত্য

এখনি নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার (ডাক্তারের প্রবেশ) এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

[ডাক্তার নীরজার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ চোখ (?) মেলেই বললে—]

নীরজা

ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে [১০২] যেতে পারব না [,] ভালো হবে না তাতে। আশীর্ব্বাদ করব তাকে [।] শেষ আশীর্ব্বাদ। (আবার এল চোখ বুজে, হাতের মুঠো শক্ত হোলো, বলে উঠল—) ঠাকুরপো [,] কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।

(এক [-] একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসচে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন [-] শিখা উঠচে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে—) কখন আসবে সরলা ? (থেকে থেকে ডেকে ওঠে) রোশনি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য

(আদিত্যের কানে কানে) সরলা দিদিমণি এসেছেন।

আদিত্যের প্রস্থান।

ও সরলাকে নিয়ে প্রবেশ।

রোশনি

কী খোঁথী ?

নীরজা

ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুণি। (এক [-] একবার আপনি বলে ওঠে—) কী হবে আমার, ঠাকুরপো ! দেব দেব দেব, সব দেব।

[ভৃত্যের প্রবেশ] [১৯]

ভৃত্য

(আদিত্যের কানে কানে) সরলা দিদিমণি এসেছেন।

[(] আদিত্যের প্রস্থান।

ও সরলাকে নিয়ে প্রবেশ। [)]

আদিত্য

(নীরজার কানের কাছে মাথা নামিয়ে) সরলা এসেছে।

নীরজা

(চোখ ঈষৎ মেলে আদিত্যকে) তুমি যাও। (আদিত্য ও ডাক্তারের প্রস্থান। নীরজা একবার ডেকে উঠল—) ঠাকুরপো। (সব নিস্তব্ধ) [১০৩]

(সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায়—) পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না। (বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—) জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব। (হঠাৎ ঢিলে সেমিজ-পরা পাংশুবর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায়—) পালা, পালা, পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে—শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত (বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর)।

(ছুটে আদিত্যের ঘরে প্রবেশ—নীরজার মৃত্যু) [১০৪]

মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

মালঞ্চ উপন্যাসের কবি-কৃত নাট্যরূপের কথা পাঠকবর্গ বহুকাল থেকেই শুনে আসছেন। এমন কি গ্রন্থটি এতকাল প্রকাশিত হয় নি বলে কেউ-কেউ অনুযোগও করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে এই নাটকটির সংবাদ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের বৎসরকাল পরেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। ১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় মালঞ্চ-উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয় অংশে বলা হয়েছে—

> মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ নাটকটি পাণ্ডুলিপি-আকারে রবীন্দ্র-ম্যুজিয়মে রক্ষিত আছে।

এর পর ১৩৫৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-রচনাবলীর উক্ত খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। তাতে ৬০৯ পৃষ্ঠায় মালঞ্চ-উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয় অংশে 'রবীন্দ্র-ম্যুজিয়ম' স্থলে 'রবীন্দ্র-ভবন' মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য এর কিছুকাল পরেই রবীন্দ্র-ভবনের নিদর্শশালা ও প্রত্নশাখার একসঙ্গে নামকরণ হয়েছে 'রবীন্দ্র-সদন'। আলোচ্য মালঞ্চ নাটকের পুঁথি বর্তমানে রবীন্দ্র-সদনের প্রত্নশাখার পাণ্ডুলিপি-বিভাগে রক্ষিত। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বহস্তে সংশোধিত ও সংযোজিত সম্পূর্ণ মালঞ্চ নাটকের একমাত্র কপিটি (ইন্‌ডেক্স নং ৪৫-বি) যথাসম্ভব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষার কাজ শুরু করবার পূর্বে আমরা একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছি। প্রথমে অনুসন্ধান করা গেল, আগাগোড়া কবির স্বহস্তে লিখিত মালঞ্চ নাটকের কোনো পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে কি না। কিন্তু পাণ্ডুলিপি-বিভাগের পূর্বাপর সংগ্রহ-তালিকা এবং সংরক্ষিত পুঁথিগুলির মধ্যে একমাত্র এই কপিটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। তারপর এ-বিষয়ে পুঁথির লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র করকে পত্র লেখা হয়। এর উত্তরে তিনি লিখেছেন—

> একমাত্র বর্তমানের এই আলোচ্য নাট্যরূপটি ছাড়া গুরুদেবের জীবদ্দশায় তাঁর দপ্তরে বা আর-কোথাও তাঁর দেখা এবং এরূপ লেখাযুক্ত 'মালঞ্চে'র আর-কোনো নাট্যরূপ ছিল বলে আমার জানা নেই।

একই পত্রে আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে লিপিকর জানাচ্ছেন—

> আপনি প্রশ্ন করেছেন গুরুদেবের হাতে-লেখা নাট্যরূপের মূল-খসড়া একটি ছিল কি না। …আসলে এইটিই গুরুদেবের নির্দেশমতো, তাঁরই হস্তলিখিত উপন্যাসের 'পাণ্ডুলিপি'- ও তাঁর দ্বারা সংশোধিত ও সংযোজিত 'অনুলিপি'- অবলম্বনে লেখা—প্রথম নাট্যখসড়া। আর এ-খসড়ায় কাহিনী, বাণী, নির্দেশনা—সব কিছুই ছিল তাঁর,—খাতায় খাতায় সে-পরিচয় আজও রয়েছে প্রত্যক্ষ।

দ্রষ্টব্য : সংযোজন খ।

এর থেকে জানা গেল রবীন্দ্র-সদনের পাণ্ডুলিপি-বিভাগে রক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ মালঞ্চ নাটকের আলোচ্য একক কপিটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১২শ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য পরে প্রত্নবিভাগের কাজের সুবিধার জন্য রবীন্দ্র-ভবনের

অন্যতম কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব উক্ত সম্পূর্ণ কপির একখানি অনুলিপি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তবে এ-ক্ষেত্রে সেই পরবর্তী অনুলিপি নিয়ে আলোচনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

এবার মালঞ্চ নাটকের একমাত্র মূল কপির পাঠ পরীক্ষার কাজ শুরু হল। প্রথমেই জানবার চেষ্টা করা গেল কপিটি কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। কপির লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র করের 'কবি-কথা' গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ, ১৯৫১) ৪০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

> 'মালঞ্চ' উপন্যাসখানিকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্তটা বই কথাবার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ণনার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল; এই করে তিন-চারখানা এক্সারসাইজ বুক-এ 'মালঞ্চে'র নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে মালঞ্চকে মঞ্চস্থ করবার কথা ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাটকটি অভিনীত না হলেও তাঁর এই ইচ্ছা থেকেই মালঞ্চ নাটকের জন্ম হয়েছে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে লিখিত বাঁশরি নাটক সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা যায়। মালঞ্চ নাটকের মতো বাঁশরিও কবির জীবিতকালে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয় নি।

সুধীরচন্দ্র ঠিকই লিখেছেন, প্রায় সমস্ত মালঞ্চ উপন্যাসটিই সংলাপে ভরা। কিন্তু তা হলেও নাটকের কপির ৪, ৫, ১৩ ও ১০৩ পৃষ্ঠায় কবি অনেক নূতন সংলাপ যোগ করেছেন। তা ছাড়া, মালঞ্চ উপন্যাসের ৪৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ২৫ পৃষ্ঠায় কবি স্বহস্তে অনেকখানি সংলাপ যোগ করে তার নীচে লিখে রেখেছেন—

> এ অংশটা নাটকের।

আলোচ্য নাট্যরূপের কপির ১৬ থেকে ১৮ পৃষ্ঠায় এই সংলাপ-অংশটি হুবহু সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এ-ক্ষেত্রে কবির নির্দেশটি সুস্পষ্ট। মালঞ্চ উপন্যাস পাণ্ডুলিপি-আকারে থাকা কালেই কবি এর নাট্যকরণের কথা ভাবছিলেন। আমরা যথাস্থানে তা উল্লেখ করেছি। (দ্রষ্টব্য : সংযোজন ক শেষাংশ; টীকাঙ্ক ৩৮ গ.)।

অবশ্য মালঞ্চ উপন্যাসের 'বর্ণনার' সকল অংশ কবি নাটকের মঞ্চ-নির্দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন নি, এবং দৃশ্যগুলিকে প্রথমটা উপন্যাসের অধ্যায় অনুসারে সাজাবার মোটামুটি পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলি নিজের হাতেই কেটেকুটে নাটকটিকে যথাসম্ভব সরল করে দিয়েছেন।
প্রথম খাতার সূচনায় '১ম অঙ্ক' কথাটি অবশ্য অনবধানে বাদ পড়েছে। তারপর দেখা যায়—

প্রথম খাতার ৯ পৃষ্ঠায় ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য। ১৬ পৃষ্ঠায় '৩য় দৃশ্য/নীরজার শয়নকক্ষ' কাটা। ১৯ পৃষ্ঠায় '৪র্থ দৃশ্য/দৃশ্যান্তর' কাটা। সুতরাং [1]+৪০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রথম খাতায় শুধুই ১ম অঙ্ক; এর মধ্যে মাত্র দুটি দৃশ্য।

দ্বিতীয় খাতা ৪১ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ। এর প্রথম থেকেই '২য় অঙ্ক' শুরু। ৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় অঙ্কের '২য় দৃশ্য' শুরু হয়ে খাতার শেষ অর্থাৎ ৭৭ পৃষ্ঠা অবধি চলেছে।

তৃতীয় খাতা ৭৮ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ, এবং এর প্রথম থেকেই ২য় অঙ্কের 'দৃশ্যান্তর' শুরু হয়েছে। ৮৭ পৃষ্ঠায় '৩য় অঙ্ক / ১ম দৃশ্য' লেখা আছে কিন্তু ৩য় অঙ্কে সত্যি কোনো দৃশ্যবিভাগ নেই। কেননা

৯১ পৃষ্ঠায় '৩য় অঙ্ক / ২য় দৃশ্য / নীরজার ঘর' কাটা এবং শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আর কোনো দৃশ্য কিংবা দৃশ্যান্তরের উল্লেখ নেই। খাতাগুলির বহু স্থানে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন থেকে লিপিকরের বিবৃতির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। কবির হাতের লেখা ও কাটকুটগুলি স্বতন্ত্র কালিতে হওয়ায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই ধরা পড়ে।

লিপিকরের উপরি-উদ্ধৃত বিবৃতিগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা গেল এবং এর পর সর্বাগ্রে মুদ্রিত মালঞ্চ উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণের (চৈত্র ১৩৪০) সংলাপ-অংশের সঙ্গে নাট্যরূপের সংলাপের পাঠ মিলিয়ে দেখা হল। বলাবাহুল্য নাটকের কপির যেসব স্থানে কবি স্বহস্তে সংশোধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন সেসব স্থলে পাঠ মেলবার কথা নয়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল এগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি স্থলে পাঠের গরমিল হচ্ছে। তখন রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল মালঞ্চ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এবং রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত তাঁর স্বহস্তে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও সংযোজিত মালঞ্চ উপন্যাসের অপরাপর সম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত কপির সংলাপ অংশের সঙ্গে নাট্যরূপের কপিটির সংলাপের পাঠ মেলানো হল। সেই সঙ্গে বিচিত্রার জন্য প্রস্তুত মালঞ্চ উপন্যাসের খণ্ডিত প্রেস কপি, বিচিত্রায় মুদ্রিত পাঠ এবং ১৩৪০-এ প্রকাশিত মালঞ্চ উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণের পাঠ—সবগুলি একসঙ্গে পরীক্ষা করা হল। ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণের পাঠও সেইসঙ্গে যোগ করা হল। এর ফলাফল নিম্নে বিবৃত হচ্ছে।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মালঞ্চ নাটকের কপি এবং অন্যান্য যেসব প্রাসঙ্গিক পাণ্ডুলিপি, অনুলিপি, প্রেস কপি মুদ্রিত রচনা ইত্যাদির পাঠ মেলানো হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

ক. মালঞ্চ নাটকের কপি, সম্পূর্ণ—

ইন্‌ডেক্‌স নম্বর ৪৫-বি। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বহুস্থলে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। লিপিকাল ১৩৪০ বাংলা। ফিকে ধূসর রঙের মলাটযুক্ত তিনখানা আবাঁধানো এক্‌সারসাইজ বুক-এ সমাপ্ত। প্রত্যেক খাতা ৮" × ৬২"।

প্রথম খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক [1] + ১-৪০

দ্বিতীয় খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক [৪১] ৪২-৭৭

তৃতীয় খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮-১০৪

খ. মালঞ্চ উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপি, সম্পূর্ণ—

ইন্‌ডেক্‌স নম্বর ৪৫। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত। লিপিকাল ১৩৪০ বাংলা। দু-খানা এক্‌সারসাইজ বুক-এ সমাপ্ত। প্রথমখানা নীল রঙের মলাটযুক্ত আবাঁধানো খাতা, দ্বিতীয় খানা চকোলেট রঙের মলাটযুক্ত বাঁধানো খাতা। প্রত্যেক খাতা ৮" × ৬২"। প্রথম খাতায় পৃষ্ঠাঙ্ক— ১-৩; ৪ পৃষ্ঠাঙ্কের পূর্বে ফিকে নীল রঙের একখানি আলাদা কাগজ এক পৃষ্ঠায় লেখা, পিনযুক্ত; অতঃপর ৪-৩২ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খাতায় পৃষ্ঠাঙ্ক :—৩৩-৪২; ৪৩ পৃষ্ঠার পূর্বে ফিকে নীল রঙের একখানি আলাদা কাগজ এক পৃষ্ঠায় লেখা, পিনযুক্ত ;—অতঃপর ৪৩-৫২ পৃষ্ঠা।

গ. মালঞ্চ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির কপি, সম্পূর্ণ—

ইন্‌ডেক্‌স নম্বর ৪৫-এ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বহুস্থলে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত।

লিপিকর : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। লিপিকাল ১৩৪০ বাংলা। নীল রঙের মলাটযুক্ত সাতখানা আবাঁধানো এক্সারসাইজ খাতায় সমাপ্ত। প্রত্যেক খাতা ৮" × ৬২" ।

প্রথম খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ১-২৩

দ্বিতীয় খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪-৩৯

তৃতীয় খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০-৫৫

চতুর্থ খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬-৭১

পঞ্চম খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ৭২-৮৭

ষষ্ঠ খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮-১০৩

সপ্তম খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৪-১০৯

ঘ. মালঞ্চ উপন্যাসের অপর একখানি কপি, খণ্ডিত—

ইন্‌ডেক্‌স নম্বর ১৬। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বহুস্থলে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। অনুলেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। মাঝখানে কেবল চারটি পৃষ্ঠা (পৃ ১২, ১২ক—গ) শ্রীসুধীরচন্দ্র কর কর্তৃক সম্ভবত বিচিত্রার প্রেস কপি থেকে অনুলিখিত এবং পরে আলপিন দিয়ে যুক্ত। যুক্তিসঙ্গত কারণে বলা যায় এর লিপিকালও ১৩৪০ বাংলা। গাঢ় লাল রঙের মলাটযুক্ত একখানা এক্সারসাইজ খাতা। এ খাতাখানাও ৮" × ৬২" । পৃষ্ঠাঙ্ক :—১-১২, ১২ক-১২গ ; ১৩-৪৪ । পৃষ্ঠাঙ্ক ১২-এর পরে ১২ক-১২গ পর্যন্ত চিহ্নিত হওয়ায় শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪ হলেও খাতাখানিতে মোট ৪৭ পৃষ্ঠা।

ঙ. মালঞ্চ উপন্যাসের প্রেস কপি (বিচিত্রার জন্য), খণ্ডিত ; ফুলস্ক্যাপ কাগজে লেখা। লিপিকাল ১৩৪০ বাংলা।

পৃষ্ঠাঙ্ক ১—লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক ২-৭—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত।

পৃষ্ঠাঙ্ক ৮-৯ ; ৯-২২ । লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক ৯ দু-বার লিখিত হওয়ায় শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২২ হলেও সবসুদ্ধ ২৩ পৃষ্ঠা।

চ. মালঞ্চ উপন্যাস : বিচিত্রায় মুদ্রিত— বিচিত্রা ১৩৪০ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ।

আশ্বিন : পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮৫-২৯৩

কার্তিক : পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২৯-৪৪০

অগ্রহায়ণ : পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬৯-৫৯০

ছ. মালঞ্চ উপন্যাস : মুদ্রিত গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৪০ বাংলা।

জ. মালঞ্চ উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ—১৩৬৫ বাংলা।

উপরি-উক্ত পাণ্ডুলিপি, অনুলিপি, মুদ্রিত কপি ও গ্রন্থ-সংস্করণগুলি যথারীতি পরীক্ষা করে এবং মিলিয়ে দেখে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা এই :—

পূর্বেই দেখা গিয়েছিল মালঞ্চ নাটকের কপিটির সংলাপ-অংশ এবং মালঞ্চ উপন্যাস প্রথম সংস্করণের (চৈত্র ১৩৪০) সংলাপ-অংশের পাঠ অনেক স্থলে মিলছে না। বানান ভুল, বিরামচিহ্নের ভুল প্রভৃতি গৌণ ভুলগুলি বাদ দিলেও শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্য এবং কখনও কখনও বাক্যগুচ্ছের পাঠে অমিল রয়েছে। প্রায় আশিটি স্থানে এরকম গরমিল দেখা যায়। কিন্তু এবার মালঞ্চ উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপি এবং কবি কর্তৃক সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত কপিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একাধিকবার মিলিয়ে দেখার ফলে যে ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাতে আশ্বস্ত হই।

নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করা গেল মালঞ্চ নাটকের কপিটির সংলাপের সঙ্গে, মুদ্রিত মালঞ্চ উপন্যাসের সংলাপের যা কিছু অমিল তা শুরু হয়েছে প্রধানত বিচিত্রার প্রেস কপি থেকে। উক্ত প্রেস কপির পূর্বে উপন্যাসটির যে তিনটি হস্তলিখিত কপি আছে তাদের কোনো-না-কোনোটিতে নাটকের আলোচ্য অংশের স্বতন্ত্র পাঠগুলির উৎস রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের লেখাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ লিপিকর-প্রমাদগুলি বাদ দিলে এখন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মাত্র দুটি স্থান ছাড়া নাটকের সংলাপের যাবতীয় অংশই ওই খাতাগুলিতে ছড়িয়ে আছে, এবং সেগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখনী-নিঃসৃত। যে দুটি স্থলে অমিল লক্ষিত হয় তাদের একটি (ক) মঞ্চ-নির্দেশনা, অপরটি (খ) একটি ছোটো সংলাপাংশ।

(ক) মঞ্চ-নির্দেশনায় মূল উপন্যাসের ওই অংশের পাঠ এইরূপ :—

> আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে···
>
> মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৩৬-৩৭।

সেই স্থলে মালঞ্চ নাটকের কপিতে মঞ্চ-নির্দেশনায় লেখা হয়েছে :

> আদিত্য নীরজার গলা জড়িয়ে ধরে ললাটের চুলগুলো সীঁথিতে পাট করে তুলে দিতে দিতে বললে···
>
> নাটকের কপি পৃ ১৯। দ্রষ্টব্য : পাঠান্তর : টীকাঙ্ক ৪০।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কারণটি স্পষ্ট। উপন্যাসে লেখক তৃতীয় ব্যক্তি-রূপে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে দৃশ্যটি পাঠকের গোচরীভূত করতে চেয়েছেন নাটকাভিনয়ে তার বাধা আছে। নাট্যকারকে প্রেক্ষাগৃহের কথা ভাবতে হয়। তাছাড়া ভারতীয় অভিনয়াদর্শের দিক থেকে মঞ্চে নায়ক-নায়িকার 'চুম্বন'-দৃশ্য প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এসব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন, সে কথা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা : নাটকের কপি থেকে বোঝা যায় লিপিকর প্রথমে উপন্যাসের মূল পাঠটিই হুবহু লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওই অংশ কাটা হয়েছে,— কেন-না সেই সঙ্গে ওই একই লাইনে পরিবর্তিত পাঠটি লিখে নেওয়া শুরু হয়েছে। 'ললাটের চুলগুলি' কথাটি লেখার অব্যবহিত পূর্বে 'কপালে—' এই অসম্পূর্ণ শব্দটি লিখে কাটা হয়েছে— এর থেকে সঙ্গত কারণেই মনে হয়, প্রথমে 'কপালের চুলগুলি' বলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য সংশোধন করে 'ললাটের চুলগুলি' বলা হয়েছে। বস্তুত এক্ষেত্রে শ্রুতিলিখনের আভাস পাওয়া যায়। যা হোক এ সম্পর্কে আমরা লিপিকরকে লিখিত-ভাবে প্রশ্ন করেছি। তাঁর লিখিত উত্তর থেকেও এই সিদ্ধান্তেই আসা যায়। তিনি লিখেছেন কপি

লিখতে লিখতে যখন যেখানেই তাঁর ঈষৎ খট্‌কা লেগেছে সেখানেই তিনি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর নির্দেশ মত কাজ করেছেন।

দ্রষ্টব্য : সংযোজন খ।

(খ) অমিলের দ্বিতীয় স্থানটি হচ্ছে একেবারে শেষের দিকে, নাটকটি সমাপ্ত হবার মুখে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এটি সংলাপাংশ। এখানে মূল উপন্যাসের পাঠ হচ্ছে :—

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর ?" পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই।

মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ১১০।

সেই স্থলে নাটকের পরিবর্তিত পাঠ নিম্নরূপ :—

নীরজা—ও কী, ও কার চিঠি ?

আদিত্য—(একটু চুপ করে থেকে) টেলিগ্রাম এসেছে।

নীরজা—কিসের টেলিগ্রাম ?

আদিত্য—মেয়াদ শেষ হবার আগেই সরলা ছাড়া পেয়েছে।"

নাটকের কপি পৃ ১০১-১০২। দ্রষ্টব্য : পাঠান্তর : টীকাঙ্ক ৭৮।

এ ক্ষেত্রে মূল উপন্যাস পড়ে দেখা যায়, আসন্নমৃত্যুর মুহূর্তে নায়িকা নীরজা নীরবে যে-চিঠিখানাতে শুধুমাত্র চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে তার মর্মগত সংবাদটুকু ঔপন্যাসিক স্বয়ং উক্ত অংশের দুটি বাক্য পূর্বেই তাঁর পাঠককে আগে থেকে জানিয়ে রেখেছেন। বলা বাহুল্য, সে অংশটি সংলাপ নয়, ঔপন্যাসিকের পরোক্ষ বিবৃতি। কিন্তু যে-হেতু নাটকের শিল্পকৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেই কারণে নাটকে নীরজার চোখ-বুলিয়ে-পড়া সংবাদটিকে কোনো-না-কোনো উপায়ে সংলাপে রূপান্তরিত করে প্রেক্ষাগৃহের সামাজিকদের শ্রুতিগোচর করানো প্রয়োজন। তা না হলে নীরজার পঠিত বিশেষ জরুরী সংবাদটি সামাজিকদের কাছে অশ্রুত এবং সেই কারণেই অজ্ঞাত থেকে যাবে। অথচ এটাও অতি সত্য কথা যে অন্তিমশয্যাশায়িনী মরণোন্মুখ নীরজাকে দিয়ে এ সময়ে মঞ্চের উপরে উচ্চ কণ্ঠে পত্রপাঠ করানো চলে না। তা ছাড়া শেষ দৃশ্যের সমাপ্তির মুখে এই চরম মুহূর্তটিতে কাউকে দিয়েই দীর্ঘ পত্র উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করানো রসের পক্ষে হানিকর। তাই অতি সঙ্গত কারণেই 'চিঠি'কে 'টেলিগ্রাম' করে এবং নীরজার দুই শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে আদিত্যের মুখে টেলিগ্রামের উপযোগী একটিমাত্র হ্রস্ব বাক্য বসিয়ে নাট্যকার জরুরি সংবাদটির সারনির্যাসটুকু সকলের শ্রুতিগম্য করে কৌশলে পরিবেশন করেছেন। এবিষয়েও লিপিকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি উল্লিখিত দুটি স্থল সম্বন্ধেই একই উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুসারে নাটকের কপিটি তিনি কীভাবে লিখে যাচ্ছিলেন তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—

যখন আমার যা প্রশ্ন জাগে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় তা মিটিয়ে নিই—এ ভাবেই লেখাটা সমাধা হয়। আপনার পত্রের শেষাংশে 'চুম্বন' ও 'চিঠি' সংক্রান্ত দুটি অংশের উদ্ধৃতিটুকু দেখলাম। এ ক্ষেত্রেও, যখন সংশয় ঠেকেছে, গুরুদেবকে বলেছি, গুরুদেব যা করতে বলেছেন, করে নিয়েছি।"

দ্রষ্টব্য : সংযোজন খ।

সুতরাং পাঠের যথার্থ গরমিলের যে দুটিমাত্র স্থান উল্লেখ করেছি তাও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই ঘটেছে বলে অনুমিত হয়। আরো বহু স্থলেই ছোটোখাটো গরমিলের ক্ষেত্রে লিপিকরের এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপিতে আদিত্যের ভ্রাতা 'রমেন' এর নাম লিখতে গিয়ে কবি কয়েক স্থানে অনবধানবশত 'রমেশ' লিখে রেখেছেন, নাটকের কপিতে সেসব ক্ষেত্রে 'রমেন'ই পাওয়া যাচ্ছে। এইরূপে, কবির সাময়িক অনবধানে মূল রচনায় কোথাও কোথাও হলা মালী নীরজাকে "বৌদিদির" পরিবর্তে "দিদিমণি" ডেকে ফেলেছে, নাটকের পাঠে তা বহুলাংশে শুধরে গিয়েছে। সম্ভবত নাটকের কপি তৈরি করার সময় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলেই এ ত্রুটিগুলি তৎক্ষণাৎ সংশোধিত হয়েছে। এ ছাড়া উপরের শেষোক্ত 'খ' দাগের উদ্ধৃতিটির একটু পূর্বেই উপন্যাসের আরো এক স্থলে বর্ণনা-অংশে চুম্বনের উল্লেখ আছে। নাটকের অনুরূপ বর্ণনাত্মক বাক্যে ওই স্থানে ফাঁক রাখা হয়েছে এবং একটি প্রশ্নচিহ্ন বসানো হয়েছে (নাটকের কপি : পৃ ১০১ : পঙ্‌ক্তি ২)। যতদূর বোঝা যায়, পূর্ববর্তী 'ক' দাগের কথা স্মরণ করে লিপিকর সম্ভবত কবির অভিপ্রায় জানবার উদ্দেশ্যে এই ফাঁক ও প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়েছেন। পরে এই শূন্য স্থান অপূর্ণ রয়ে গেছে। পরিশিষ্ট খ-এ মুদ্রিত লিপিকরের পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

কিন্তু তথাপি, সাধারণ লিপিকর-প্রমাদ (যেমন বানান ভুল, বিরামচিহ্নের ভুল ইত্যাদি) ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ স্থলে লিপিকরের অনবধানতা হেতু উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপির ভুল পাঠটি নাটকে অবিকল সেইভাবেই পুনর্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ সব ক্ষেত্রে লিপিকর কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। এ ছাড়া উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রথম কয়েক ছত্র পরেই এক স্থলে "রজনীগন্ধার গুচ্ছ" লেখা আছে, লিপিকরের অনবধানে "গুচ্ছ" স্থলে "গাছ" লেখা হয়ে গেছে। অবশ্য শেষোক্ত ভুলটিকে লিপিকর-প্রমাদের পর্যায়েও ফেলা যায়।

'মালঞ্চের নাট্যকরণে'র কাল-নির্ণয়

রবীন্দ্রনাথ মালঞ্চ উপন্যাসের প্রথম অংশ রচনা করেন বরানগরে ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের গৃহে। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৪ মার্চ, ১৯৩৩ তারিখে কবি লিখছেন—

রাণী,

কোথায় মিলালো বাগান, মগজ থেকে ছুটে দৌড় দিল অর্কিডের চর্চা, অকাল-বিকশিত ক্রিসেন্থিমমের তো কথাই নেই। সরলার চেহারা ঝাপসা হয়ে গেছে, আদিত্য মোটরে করে নিউ মার্কেটে চলে গেছে, আর এ পর্যন্ত ফিরলো না। আমি গল্প জমাই কাদের নিয়ে। ...তা ছাড়া বরাহনগরের মালিনীর তারস্বরমুখর হাস্যালাপের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। সেখান থেকে নির্বাসিত বাতাবি লেবুর ফুল গেছে ঝরে, ফলের গুটি কেটে দিয়েছি— তাই এরাও রয়েছে মূক হয়ে। তাই আমার গল্পটা শুক্লচতুর্দশীর রাত্রি আর পেরোলো না।...[১]

এর পর অর্ধসমাপ্ত মালঞ্চ-উপন্যাসখানি কবি আবার কবে ধরেছিলেন তাঁর চিঠি থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে এই চিঠি লেখার মাসেক-কাল পরে তিনি লিখতে শুরু করেছেন একটা নূতন গল্প। ১৮ এপ্রিল ১৯৩৩ শ্রীমতী মহলানবিশকে শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন—

...একটা নূতন গল্প চলচে। আর দু-তিন-দিনে শেষ হবে। সকলে অপেক্ষা করছে শেষ হলেই শ্রীমুখ থেকে শুনবে— প্রথম শোনানির জন্যে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সেই বুঝে ব্যবস্থা করো।...[২]

এই 'নূতন গল্প' হচ্ছে 'ললাটের লিখন'। গল্পটি শেষ করে শান্তিনিকেতনবাসীদের শোনানো হল এবং এই সংবাদ জানিয়ে পূর্বের চিঠির তিন দিন পরে— ৮ বৈশাখ, ১৩৪০ (২১ এপ্রিল, ১৯৩৩)— শ্রীমতী মহলানবিশকে কবি লিখলেন—

...কাল পড়া হয়ে গেল। যাদের জন্যে পাঁচ পয়সা খরচ করি নি খুশী হয়ে গেছে। বলচে পাউয়ারফুল। ফরমাস এসেছে ওটাকে ঢালাই করতে হবে নাট্যে। চেষ্টা করতে বসলুম।...[৩]

শান্তিনিকেতনের শ্রোতাদের 'ফরমাস' মঞ্জুর করে কবি 'ললাটের লিখন'-কে 'নাট্যে ঢালাই' করে লিখলেন 'বাঁশরি'। নাটকটি শান্তিনিকেতনে পড়ে শোনানো হল ২৩ এপ্রিল, ১৯৩৩ (১০ বৈশাখ ১৩৪০), এবং এর তিন দিন পরে শ্রীমতী মহলানবিশকে কবি লিখে জানালেন—

...আগামীকাল, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কলকাতা যাচ্ছি। লেখাটা শেষ হয়েছে।...তোমার বৈঠকখানায় ওটা শোনাতে পারলে খুশী হব।...দার্জিলিং যাব কি না সন্দেহ।...ইতি ২৬ এপ্রিল ১৯৩৩ (১৩ বৈশাখ ১৩৪০)।[৪]

---

১. রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ২৩০ ; দেশ, ৯ ভাদ্র, ১৩৬৮। পৃ ৩১৪
২. ঐ ঐ : ঐ ২৩২ : ঐ ঐ ঐ। পৃ ৩১৫
৩. ঐ ঐ : ঐ ২৩৩ : ঐ ঐ ঐ। পৃ ঐ
৪. ঐ ঐ : ঐ ২৩৪ : ঐ ঐ ঐ। পৃ ঐ

এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী মহলানবিশের লেখা পাদটীকা থেকে জানা যাচ্ছে, 'বাঁশরি বইখানা এই সময়ে বরানগরে পড়া হোলো।'

কিন্তু মালঞ্চ-উপন্যাসটির অবশিষ্ট অংশ রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে শেষ করেছিলেন সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> গদ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গল্প বলিবার ইচ্ছা রূপ পাইল 'দুই বোন'-এ। প্রায় এক বৎসর পরে লেখেন 'মালঞ্চ'। এই দুইটি ছোট উপন্যাসের সমসাময়িক রচনা 'বাঁশরী' নাটক— প্রথম খসড়ায় নাম ছিল 'ললাটের লিখন'। বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইবার পূর্বে নাটকটির খসড়া শান্তিনিকেতনবাসীদের নিকট পড়িয়া শোনান (১৯৩৩ এপ্রিল ২৩॥১৩৪০ বৈশাখ ১০)।[৫]

আবার শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'কবি সার্বভৌম' গ্রন্থে লিখছেন—

> সেদিন বোধহয় ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। দার্জিলিং-এ গ্লেন ইডেন নামে একটি বাড়িতে গুরুদেব অবকাশ যাপনে এসেছেন। 'মালঞ্চ' গল্পটি তখন সদ্য রচনা শেষ হয়েছে। একদিন তাই দার্জিলিং-এ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ এলো গল্প শোনাবার। কবি পড়ে শোনালেন মালঞ্চ। বাঁশরি ও মালঞ্চ এ দুটি গল্পই (?) সেবার দার্জিলিং-এ লেখা হয়। বাঁশরির আগের নাম ছিল ললাটের লিখন।[৬]

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর বাঁশরি নাটক সম্বন্ধীয় উক্তির সঙ্গে আমাদের পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিগুলির মিল হচ্ছে না। বাঁশরি তো এর আগেই লেখা হল, মালঞ্চ উপন্যাস কি দার্জিলিঙে শেষ হয়েছে? আমাদের মনে হয়, শান্তিনিকেতনে ও বরানগরে বাঁশরি নাটক পাঠ করার পর দার্জিলিঙে গিয়ে কবি হয়তো লেখাটির আরো খানিকটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন। মালঞ্চ-উপন্যাসও খুব সম্ভব দার্জিলিঙে বসে শেষবারের মতো সংশোধন করেন। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ঐ সময়ে কবিকণ্ঠে এ-দুটির পাঠ শুনে থাকবেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মালঞ্চ উপন্যাসের ইনডেক্স নম্বর ১৬ পাণ্ডুলিপিটি (খণ্ডিত) শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীই লিখেছিলেন, এবং খুব সম্ভব এটি দার্জিলিঙেই লেখা।

তবে মালঞ্চ উপন্যাস যখনই শেষ হয়ে থাক্, শুধু এটুকু জানলেই মালঞ্চ নাটকের রচনাকাল নির্ণয় করা যায় না। তাই আমরা কবির চিঠিপত্রের মধ্যে নূতন করে সূত্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এবার শ্রীমতী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আরো একখানি পত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়— পত্রের তারিখ ১ ভাদ্র, ১৩৪০ (১৭ আগস্ট, ১৯৩৩)। ঠিক ওই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর 'চণ্ডালিকা' নাটিকাটি আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান। এরই কাছাকাছি সময়ে 'তাসের দেশ' নাটকটিও রচিত হয়। অনেকের স্মরণ থাকতে পারে, এর কিছুদিন পরে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থের প্রয়োজনে কলকাতা ম্যাডান থিএটরে ২৭, ২৮ ও ৩০ ভাদ্র, ১৩৪০— এই তিন দিন তাসের দেশের অভিনয় হয়। এছাড়া প্রথম রাত্রে কবি চণ্ডালিকা নাটিকাটি শ্রোতাদের স্বয়ং পাঠ করে শোনান। শ্রীমতী মহলানবিশকে লেখা

---

৫. রবীন্দ্র-জীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ৩য় খণ্ড সং ১৩৬৮ : পৃ ৪৭১

৬. কবি সার্বভৌম : মৈত্রেয়ী দেবী : পৃ ১৫

উক্ত চিঠিতে মালঞ্চ-নাটকের সঙ্গে একটি প্রবন্ধ এবং একটি নৃত্যনাট্যেরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কবি লিখছেন—

> …বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা দাবি করে না অথচ সেই সর্তে আমাকে যৎসামান্য কিছু দিয়ে থাকে।…বিশেষ মনোযোগ করেই ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি।[৭] বিস্তর সময় লেগেচে, কেননা মনের গতি হয়েছে মন্থর, দেহের গতি হয়েছে শিথিল। তারপরে মালঞ্চের নাট্যকরণে কোমর বাঁধতে হোলো। কারণ কোমরের প্রতিবেশী জঠরের তাগিদ ছিল। অথচ অভিনয় হতে পারবে বলে আশা নেই। তারপরে বউমার বিশেষ নির্বন্ধবশত একটা নৃত্যনাট্য[৮] লিখতে হোলো— ছোটো কিন্তু তার উপরে স্যাকরার কাজ করতে হয়েচে— সূক্ষ্ম কাজ।…অথচ সেটাও যে নাট্যমঞ্চে চড়তে পারবে সে সম্বন্ধে সংশয় আছে।[৯]

এই চিঠি থেকে স্বভাবতই অনুমান করা যায়, ১৩৪০ সালের ১ ভাদ্রের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে 'মালঞ্চের নাট্যকরণ' করেছিলেন তাই নয়, 'তারপরে' শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর অনুরোধে 'একটা নৃত্যনাট্য'ও সমাপ্ত করেন।

এবার আমাদের পক্ষে 'মালঞ্চের নাট্যকরণের কাল'কে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে আনা সম্ভব হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মালঞ্চ-নাটকের কবি-কর্তৃক সংশোধিত ও সংযোজিত একমাত্র কপিটির লিপিকাল ১৩৪০ সাল। লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তখনও শান্তিনিকেতনেই কাজ করতেন, এবং

৭. প্রবন্ধটি খুব সম্ভব 'ছন্দের প্রকৃতি'। ছন্দ বইয়ের প্রথম সংস্করণে প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১৩৪০ সালের ৩১ ভাদ্র (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)।

দ্রষ্টব্য: ছন্দ: পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬২; শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত: পৃ ৪১৫, ৪৪৩। লক্ষণীয়, শ্রীমতী মহলানবিশকে এই পত্র লেখার ৩০ দিন পরে উক্ত প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

৮. শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে মনে হয় এই নৃত্যনাট্যটি খুব সম্ভব 'তাসের দেশ', যা ওই সময়েই রচিত এবং ১৩৪০ সালের ২৭, ২৮ ও ৩০ ভাদ্র (শ্রীমতী মহলানবিশকে পত্র লেখার ২৬ দিন পরে) ম্যাডান থিএটরে অভিনীত। এটি 'চণ্ডালিকা' নয়, তার কারণ চণ্ডালিকা তখনো 'বাণীনাট্য'—তা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে আরো সাড়ে চার বৎসর পরে (ফাল্গুন ১৩৪৪)। ম্যাডান থিএটরে অভিনয়ের প্রথম রাত্রে কবি ওই বাণী-নাটিকাটি পাঠ করে শোনান। তবে কবির পাঠের সঙ্গে স্থানে স্থানে শান্তিনিকেতনের গানের দল কর্তৃক কয়েকটি গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল,—এই মাত্র। অপর পক্ষে তাসের দেশ নাটিকাটি খাঁটি নৃত্যনাট্যের কোঠায় না পড়লেও এতে যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের নৃত্যনাট্যের খানিকটা আভাস এসেছে এ-কথা স্বীকার করতে হয়। ম্যাডান থিএটরে এই নাটিকার অভিনয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ স্পষ্টই লিখেছেন—'সাধারণ কথাবার্তায় অভিনয়ের মাঝে মাঝে গানগুলি নাচে অভিনয় করতে হয়েছিল।' দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রসংগীত শান্তিদেব ঘোষ, সং ১৯৬২: পৃ ২৪৯।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা গেল, গল্পগুচ্ছের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নিয়ে ব্যালের আদর্শে একটি নৃত্যাভিনয় খাড়া করবার চেষ্টা থেকেই 'তাসের দেশ' নাটকের সৃষ্টি। ব্যালের প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। পুত্রবধূর একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে কবি স্বয়ং এই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং আগাগোড়া সম্পূর্ণ নাটকটি রচনা করেন। শ্রীমতী মহলানবিশকে লেখা 'বউমার নির্বন্ধবশত' কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৯. রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ২৪০ : দেশ, ১৬ ভাদ্র, ১৩৬৮ : পৃ ৪০২

তিনি কবির সঙ্গে দার্জিলিঙ যান নি। যদি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর উক্তি থেকে এ-রকমও ধরে নেওয়া যায় যে দার্জিলিঙ অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ মালঞ্চ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি শেষবারের মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেই পাঠ করেছিলেন, তা হলেও অতি সঙ্গত কারণেই মনে করা যেতে পারে যে কবি একে নাট্যরূপ দিয়েছেন দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে— শান্তিনিকেতনে। কবি দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন ২৭ এপ্রিল, ১৯৩৩ (১৩ বৈশাখ, ১৩৪০),[১০] আর সেখান থেকে ফিরলেন জুলাই মাসের গোড়ার দিকে (১৯৩৩)।[১১] অর্থাৎ বাংলা ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে আষাঢ়ের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কবি ছিলেন দার্জিলিঙে। তারপর শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে খুব সম্ভব আষাঢ়ের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি কাজই পরিসমাপ্ত করেন—প্রথমে 'ছন্দ সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধ', তারপর 'মালঞ্চের নাট্যকরণ' এবং সর্বশেষে 'একটা নৃত্যনাট্য'। শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখিত পত্রের ভাষার মধ্যেও কাজগুলির সদ্যসমাপ্তি-জনিত ক্লান্তির আভাস লক্ষিত হয়।

---

১০. রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ৩য় খণ্ড সং ১৩৬৮ : পৃ ৪৭৬
১১. ঐ : ঐ : ঐ ঐ : পৃ ৪৮২

সংযোজন ক

মালঞ্চ নাটকে কবির স্বহস্তের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি ৪৫-বি

পৃ ৪-এর সঙ্গে যুক্ত—'ওর যে আগুন জ্বলছে বুকে'—এর পরে—

'ঐ যে হলা চলেচে দাঁতন করতে করতে দীঘির দিকে।······আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?'

মোট ছত্রসংখ্যা ৫৯। সর্বশেষের বাক্যটি মালঞ্চ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতেও আছে।

পৃ ৯-এর সঙ্গে যুক্ত—'ধীরে ধীরে ঘর থেকে সরলার প্রস্থান'—এর পরে—

হলা

দিদিমণি [বউদিদি], একটা পিতলের ঘটি······তুই এখন যা।

প্রস্থান

মোট ছত্রসংখ্যা ১৩।

পৃ ১৩-এর সঙ্গে যুক্ত—'হরলিক্স দুধের পাত্রটা······সরলা চলে গেল'—এর পরে—

নীরজা

যেয়ো না, শোনো সরলা,······ওর কী সকলের আগে তোমাদের চোখে পড়ে বলো দেখি!

মোট ছত্রসংখ্যা ২২।

পৃ ১৬-১৮ : ১৬ পৃষ্ঠায় 'সরলা ও রমেনের প্রস্থান'—এর পরে—

নীরজা

রোশ্‌নি শুনে যা।······তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।

আয়ার প্রস্থান

এর সংলাপাংশ মালঞ্চ উপন্যাসের একটি কপির সঙ্গে যুক্ত : মালঞ্চ উপন্যাসের ৪৫-সংখ্যক মূল পাণ্ডুলিপির ৪৫-এ সংখ্যক কপির ২৫ পৃষ্ঠায় 'রমেন চলে গেল'— এর পরে এই দীর্ঘ সংলাপটি কবির স্বহস্তে সংযোজিত, এবং এটি যে নাট্যাংশ এইরূপ নির্দেশযুক্ত। সংযোজনটি উক্ত কপির ২৫ পৃষ্ঠার পূর্বে (২৪ পৃষ্ঠার বিপরীত দিকের খালি পৃষ্ঠায়) দুই স্তম্ভে লেখা। মোট ছত্রসংখ্যা ৩৩ : প্রথম স্তম্ভে ২১ ; দ্বিতীয় স্তম্ভে ১২।

দ্বিতীয় স্তম্ভের নীচে কবির স্বহস্তের নির্দেশ —

'এ অংশটা নাটকের।'

দ্রষ্টব্য : নাটকের উদ্দেশ্যে নূতন সংযোজিত হলেও এটি বিচিত্রা কার্তিক ১৩৪০-এর প্রেস কপি তৈরি হবার পূর্বেই কবি-কর্তৃক লিখিত, কেননা বিচিত্রার ওই সংখ্যায় (পৃষ্ঠা

৪৩২-'৩৩) এই অংশটি মালঞ্চ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং তারপর থেকে এটি মুদ্রিত উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়ে আসছে।

পৃ ১০৩-এর সঙ্গে যুক্ত—'দেব দেব দেব, সব দেব'—এর পরে

'সরলার প্রবেশ' কেটে—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য······

ও সরলাকে নিয়ে প্রবেশ।

মোট ছত্রসংখ্যা ৫।

সংযোজন খ

লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র করের পত্র*

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২৩।১০।৬৫ তারিখের লেখা পত্র পেয়ে বাধিত হলাম। 'মালঞ্চ'-উপন্যাসের (রচনা ১৩৪০ সন) নাট্যরূপ-সম্বন্ধে আমার 'কবিকথা'-গ্রন্থের (রচনা ১৩৫৮ সন) ৪০ পৃষ্ঠায় রচনা-প্রসঙ্গ নামক অধ্যায়ে, ঘটনার ১৮ বছর ব্যবধানে, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই যেটুকু লেখার লিখেছিলাম। তারপরে আজ ১৩৭২ সনে আরো চোদ্দ বছর ব্যবধানে, মূল ঘটনার ৩২ বছর পরে, আপনার এই পত্রের জিজ্ঞাসায় জাগাল একটি পুরোনো কিন্তু অতি-প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের পুনরালোচনা। বিলম্বে হলেও কাজটি যে শুরু হয়েছে এটি সু-খবর।

এ-প্রসঙ্গে গোড়া থেকেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো,—জিনিসটা সর্বাংশে একান্তই গুরুদেবের। দপ্তরের কর্মীরূপে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমরা যখনই তাঁর যেটুকু কাজে এসেছি, সে তাঁরি অনুগ্রহে, আজ্ঞায় এবং তাঁরি প্রভাবেও বটে। 'কবিকথা'য় সাধারণভাবে তথ্য-হিসাবেই মাত্র সব লিখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে জানাবার বিষয় হচ্ছে সবিশেষ-রকমের ও জরুরি। এ উপলক্ষ্যে ৮।১১।৬৫ তারিখে 'রবীন্দ্রভবনে' বসে তাড়াতাড়িতে কাগজ-পত্র কিছু-কিছু দেখে নেওয়া গেল এবং তারই ফলে বক্তব্যটা এবারে আর-একটু বলার পথ হল। বহুদিনের কথা, ঠিক করে সব বলা কঠিন। তবু যা বলবার আপাতত বলে রাখি।

গুরুদেব ১৩৪০ সনের গোড়ার দিকে দুখানা খাতায় 'মালঞ্চ'-উপন্যাসের মূল-খসড়া লিখে শেষ করেন। তখন আসে কপির পালা। সে-কপি আমি ৭টি খাতায় তৈরি করি। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের কথা হয়। তিনি বলেন, উপন্যাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে দৃশ্যভাগ করে বর্ণনাস্থলগুলি ও প্রবেশ-প্রস্থানাদির মঞ্চোপযোগী নির্দেশগুলি বন্ধনীভুক্ত রেখে পাত্রপাত্রীর উক্তিসমূহ পর-পর বসিয়ে নিয়ে

* রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার সম্পাদক-কে লিখিত।

১০

নাট্যরূপের একটা খসড়া করে দিতে। অতঃপর, সে-ভাবেই কিছু-কিছু করে পরিষ্কাররূপে লিখে নিয়ে তাঁকে দেখাতে থাকি এবং সেই অংশগুলি দেখে যেতে-যেতে গুরুদেবও আবশ্যকমতো স্থলে-স্থলে তাতে সংশোধন ও সংযোজন করে চলেন। দৃশ্য-বিভাগেরও তিনি দু-এক স্থলে পরিবর্তন করেন। যখন আমার যা প্রশ্ন জাগে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনায় তা মিটিয়ে নিই,—এভাবেই লেখাটি সমাধা হয়। আপনার পত্রের শেষাংশে 'চুম্বন' ও 'চিঠি' সংক্রান্ত দুটি অংশের উদ্ধৃতিটুকু দেখলাম। এক্ষেত্রেও বক্তব্য, যখন সংশয় ঠেকেছে, গুরুদেবকে বলেছি, গুরুদেব যা করতে বলেছেন, করে নিয়েছি। বলা আবশ্যক, 'চিঠি'র অংশের আগেই উপন্যাসে আরেকবার 'চুম্বনে'র আর-একটি স্থল আছে এবং নাট্যরূপেও দৃশ্যের বর্ণনা-অংশে সে-স্থলটিতে গুরুদেবের নির্দেশের অপেক্ষায় একটুখানি ফাঁক ও একটি প্রশ্নচিহ্ন রেখেছিলাম। কপিতে তার নিদর্শন রয়েছে।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, গুরুদেবের হাতে-লেখা নাট্যরূপের মূল-খসড়া একটি ছিল কি না? আমার উল্লিখিত বিবৃতি থেকে বুঝতে পারবেন, আসলে এইটিই গুরুদেবের নির্দেশমতো,—তাঁরই হস্তলিখিত উপন্যাসের 'পাণ্ডুলিপি' ও তাঁর দ্বারা সংশোধিত 'অনুলিপি' অবলম্বনে লেখা—প্রথম নাট্যখসড়া। আর এ-খসড়ায় কাহিনী, বাণী, নির্দেশনা—সব-কিছুই ছিল তাঁর,—খাতায়-খাতায় সে-পরিচয় আজো রয়েছে প্রত্যক্ষ,—এই অর্থেই এ-খসড়াটিকে সেদিন 'কপি' বলে ধরা হয়েছিল। একমাত্র বর্তমানের এই আলোচ্য নাট্যরূপটি ছাড়া গুরুদেবের জীবদ্দশায় তাঁর দপ্তরে বা আর-কোথাও তাঁর দেখা এবং এরূপ লেখাযুক্ত 'মালঞ্চে'র আর-কোনো নাট্যরূপ ছিল ব'লে আমার জানা নেই। আপনি ভালো করে দেখেছেন, দেখছেন,—শেষে ভালো করে আপনিই আশা করি সব বলতে পারবেন।

নমস্কার। ইতি—

নিবেদক
স্বাঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর
শান্তিনিকেতন
১৪।১১।৬৫

মালঞ্চের পাঠান্তর ও পাঠগত মিল

(উপন্যাস ও নাটক)

পাঠান্তর নির্দেশের সুবিধার জন্য মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি, মালঞ্চ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, ওই পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ অনুলিপি, খণ্ডিত অনুলিপি, আংশিক প্রেসকপি, বিচিত্রায় মুদ্রিত মালঞ্চ উপন্যাস, মালঞ্চ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এবং ১৩৬৫ সালের পুনর্মুদ্রণ—সর্বমোট এই আটখানি পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ ইত্যাদিকে 'ক' থেকে 'জ' পর্যন্ত সংকেত চিহ্নে প্রকাশ করা গেল। পাঠান্তর নির্দেশকালে যথাস্থানে এই সঙ্কেতগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। দাঁড়ি-চিহ্নযুক্ত সঙ্কেত-সংখ্যাগুলি টীকাঙ্কের পরিচায়ক। বন্ধনী-চিহ্নের অন্তর্গত সংখ্যা বা সংখ্যাগুলির দ্বারা পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ প্রভৃতির পৃষ্ঠা বোঝানো হচ্ছে।

ক.	ইন্‌ডেক্স নং ৪৫ বি	পাণ্ডুলিপি—মালঞ্চ নাটক—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত এবং স্থলে স্থলে সংযোজিত।
খ.	” নং ৪৫	পাণ্ডুলিপি—মালঞ্চ উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত দুখানা মূল-খাতা।
গ.	” নং ৪৫ এ	পাণ্ডুলিপি—মালঞ্চ উপন্যাস—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত এবং স্থলে স্থলে সংযোজিত।
ঘ.	” নং ১৬	মালঞ্চ উপন্যাসের প্রথমাংশের অনুলিপি—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী অনুলিখিত এবং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত। মাঝখানে চার পৃষ্ঠার (পৃ ১২, ১২ ক-গ) লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।
ঙ.	কভার ফাইল	প্রেসকপি (বিচিত্রার জন্য)—খণ্ডিত। পৃ ১-৯ ; ৯-২২ : মোট পৃ সংখ্যা—২৩। পৃ ২-৭ কবি-কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত ; অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলির লিপিকর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।
চ.		বিচিত্রা—১৩৪০ আশ্বিন-পৌষ।
ছ.		মালঞ্চ (উপন্যাস)—মুদ্রিত গ্রন্থ : প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বাংলা।
জ.		মালঞ্চ (উপন্যাস)—পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫ বাংলা।

১। ক. (১) রজনীগন্ধার গাছ
খ. (১) রজনীগন্ধার গুচ্ছ
গ. (১) ঐ
ঘ. (১) ঐ
ঙ. (১) ঐ
চ. (২৮৫) ঐ
ছ. (২) ঐ
জ. (৫) ঐ

২। ক. (১) ঘাঘরার উপর সাড়ি
খ. (৪) ঘাগরার উপর সাড়ি
গ. (৮) ক-র অনুরূপ
ঘ. (৮) ঐ
ঙ. (৪) ঘাঘরার উপরে ওড়না (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১০) ঐ
জ. (১১) ঐ

৩। ক. (১) আয়া বসল হাঁটু উঁচু করে
খ. (৪) ঐ
গ. (৮) ঐ
ঘ. (৮) ঐ
ঙ. (৪) হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১০) ঐ
জ. (১১) ঐ

৪। ক. (১) সরলাকে নিয়ে বুঝি উনি বাগানে গিয়েছিলেন ?
খ. (৪) ঐ
গ. (৯) ঐ
ঘ. (৯) ঐ
ঙ. (৪) সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন। (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১১) ঐ
জ. (১২) ঐ

৫। ক. (১) আমাকেও তো এমনি করে ভোরে জাগিয়ে বাগানের কাজে রোজ নিয়ে যেতেন।
খ. (৪) ঐ
গ. (৯) ঐ
ঘ. (৯) ঐ
ঙ. (৪) ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই।
(কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১১) ঐ
জ. (১২) ঐ

৬। ক. (১) এতগুলো মালী মাইনে খাচ্চে তবু ওঁকে নইলে বাগান শুকিয়ে যেত বুঝি
খ. (৪) ঐ
গ. (১০) ঐ
ঘ. (৯) ঐ
ঙ. (৪) ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১১) ঐ
জ. (১২) ঐ

৭। ক. (১) নিয়ুমার্কেটে ভোর বেলাকার ফুলের চালান
খ. (৪) ভোর বেলাকার ফুলের চালান
গ. (১০) নিয়ুমার্কেটে ভোর বেলাকার ফুলের চালান ('নিয়ুমার্কেটে' শব্দটি কবি-কর্তৃক স্বহস্তে সংযোজিত)।
ঘ. (৯) ঐ
ঙ. (৪) ঐ (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১১) ঐ
জ. (১২) ঐ

৮। ক. (২) আজও ফুলের চালান গিয়েছিল। গাড়ির শব্দ শুনেছি।
খ. (৪) ঐ । দূরের থেকে গাড়ির শব্দ শুনেছি।
গ. (১০) ঐ । ক-এর অনুরূপ। ('দূরের থেকে' কবির স্বহস্তে কাটা)।
ঘ. (৯) ঐ । ঐ ।

ঙ. (৪) সেই রকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৮) ঐ
ছ. (১১) ঐ
জ. (১২) ঐ

৯। ক. (২) আর সেদিন নেই। লুঠ চলছে এখন দু-হাতে।
খ. (৪) ঐ । লুঠ চল্‌ছে এখন দু'হাতে।
গ. (১১) ঐ
ঘ. (১০) ঐ
ঙ. (৪) সেদিন নেই, এখন লুঠ চল্‌চে দু'হাতে (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৯) ঐ
ছ. (১২) সেদিন নেই, এখন লুঠ চল্‌চে দু'হাতে।
জ. (১২) ঐ

১০। ক. (২) আমি কি মিথ্যে বলছি ?… ফুলের বাজার বসে যায়
খ. (৪) এই অংশ নেই।
গ. (১১) আমি কি মিথ্যে বলচি ?…ফুলের বাজার বসে যায় (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।
ঘ. (১০) ঐ
ঙ. (৫) ঐ (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৯) আমি কি মিথ্যা বলচি ?…মালীদের ফুলের বাজার বসে যায় (সম্ভবত প্রুফ শীট-এ 'মালীদের' শব্দটি সংযোজিত)।
ছ. (১২) ঐ
জ. (১৩) ঐ

১১। ক. (২) চোখ থাকতেও যদি না দেখে তো কী আর বলব ?
খ. (৪) এই অংশ নেই।
গ. (১১) চোখ থাকতেও যদি না দেখে তো কী আর বলব ! (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।
ঘ. (১০) ঐ
ঙ. (৫) দেখবার গরজ এত কার ? (কবির স্ব-লিখিত)।
চ. (২৮৯) ঐ
ছ. (১২) ঐ
জ. (১৩) ঐ

১২। ক. (৩) বলব ! এতবড় বুকের পাটা কার ! এখন কি আর সে রাজত্বি আছে ? মান

বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি একটু জোর করে বলো না কেন খোঁখী ! তোমারি তো সব !

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) ক-এর অনুরূপ। কেবল 'আছে'-এর পরে '?' চিহ্নের স্থলে '!' চিহ্ন, এবং 'রাজত্তি' স্থলে 'রাজত্বি'। (কবির স্বহস্তে লিখিত)।

ঘ. (১০-১১) ঐ

ঙ. (৫) আমি বলবার কে ? মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে তো। তুমি বল না কেন ? তোমারি তো সব। (কবির স্ব-লিখিত)।

চ. (২৮৯) ঐ

ছ. (১২) ঐ

জ. (১৩) ঐ কেবল 'তোমারি' স্থলে 'তোমারই'।

১৩। ক. (৩) এমনি চলুক না কিছুদিন, যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনিই পড়বে ধরা। তখন বুঝবে মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। ('সৎমায়ের' শব্দটি কবি-কর্তৃক সংশোধিত)। ওর সরলার চেয়ে বাগানের দরদ কেউ জানে না ! চুপ করে থাক্ না, দর্পহারী মধুসূদন আছেন।

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) ক-এর অনুরূপ, কেবল 'সৎমায়ের' স্থলে 'ডাইনির' এবং 'বাগানের দরদ'-স্থলে 'বাগান'। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

ঘ. (১১) ক-এর অনুরূপ—কেবল 'সৎমায়ের' এবং 'বাগানের দরদ' কবির স্বলিখিত।

ঙ. (৫) চলুক না এমনি কিছুদিন, তারপরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ্‌ করে থাক্ না। সরলার গুমর কতদিন থাকে আমি দেখতে চাই। (কবির স্ব-লিখিত)।

চ. (২৮৯) ঐ কেবল 'সরলার·· দেখতে চাই'—এই অংশ নেই।

ছ. (১২) ঐ

জ. (১৩) ঐ

১৪। ক. (৩) আমি মালীকে দোষ দিইনে। নতুন মনিবকে ও সইবে কেমন করে ?···ওকে হুকুম করতে আসে। হলা আমার কাছে নালিশ করেছিল, শুধিয়েছিল এসব ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে হবে নাকি। আমি ওকে বলে দিলুম— 'শুনিস কেন ! চুপ্‌ করে থাক্,—কিছু করতে হবে না।

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) ক-এর অনুরূপ। শেষ ছত্র 'চুপ্‌ করে বসে থাক্'। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

ঘ. (১১) ঐ

ঙ. (৫) মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন?…হুকুম করতে এলে সে কি মানায়? হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস্ নে কথা, চুপ করে থাক্।

চ. (২৮৯) ঐ

ছ. (১৩) ঐ

জ. (১৩) ঐ

১৫। ক. (৪) সেদিন জামাইবাবু রাগ করে ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বাগানে গোরু ঢুকেছিল। তিনি বললেন, "গোরু তাড়াসনে কেন?" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু? গোরুই তো আমাকে তাড়া করে। আমার প্রাণের ভয় নেই?"

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) ক-এর অনুরূপ। (কবি-কর্তৃক স্বহস্তে সংযোজিত)।

ঘ. (১১-১২) ঐ

ঙ. (৫) "সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"
"কেন, কী জন্যে?"
"ও বসে বসে বিড়ি টানচে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্চে। জামাই বাবু বললে, "গরু তাড়াসনে কেন?" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই?" (কবির স্বহস্তে লিখিত)।

চ. (২৮৯) ঐ

ছ. (১৩) ঐ

জ. (১৪) ঐ

১৬। ক. (৪) [নীরজা] তা যাই হোক, ও যাই করুক, ও আমার নিজের হাতে তৈরি। ওকে তাড়িয়ে বাগানে নতুন লোক আনলে, সে আমি সইতে পারব না। তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায়নি সে আমি কি বুঝিনে? ওর যে আগুন জ্বলেছে বুকে। ঐ যে হলা চলেছে দাঁতন করতে করতে দীঘির দিকে ডাক্‌তো ওকে। (নিম্নরেখ অংশটি কবি-কর্তৃক স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) [নীরজা] ও যাই করুক আজকাল,…হাতের তৈরি। নতুন লোক আনবেন বাগানে,…গণ্ডারই ঢুকুক।…সে কি আমি…।…জ্বলচে…। আচ্ছা আয়া তুই

ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন। (নিম্নরেখ অংশগুলি কবির স্বহস্তে লেখা। শেষ বাক্যটি 'ক'-এ কবি কর্তৃক বর্জিত)।

ঘ. (১২) 'ক'-এর অনুরূপ। শুধু 'হাতে' স্থলে 'হাতের' এবং 'জলেছে' স্থলে 'জলছে'।

ঙ. (৫) [নীরজা] "ওর ঐ রকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরি।" 'ও যাই করুক'—এই অংশ নেই।

[রোশনি] "জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"
[নীরজা] "চুপ কর্ রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায়নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জলচে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেচে। ডাক্ তো ওকে।" (এর সমস্তটাই কবির স্ব-লিখিত)।

চ. (২৮৯) 'ঙ'-এর অনুরূপ।

ছ. (১৪) তা যাই হোক···ও আমার···ডাকতো ওকে।

জ. (১৪) ঐ

১৭। ক. (৪-৫) আয়া—হলা, হলা···নীরজা—আচ্ছা আয়া তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন? (কবির স্বহস্তের পরিবর্তন সহ পুনর্লিখিত—পূর্বের দাগের অব্যবহিত পরে)।

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) এই অংশ নেই।

ঘ. (১২,১২ ক-গ) খাতার এই অংশের পাঠ বহুলাংশে স্বতন্ত্র। অংশটি স্বতন্ত্র কাগজে সম্ভবত বিচিত্রার প্রেসকপি (পৃ ৫) থেকে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর কর্তৃক অনুলিখিত, এবং পরে আলপিন দিয়ে যুক্ত।

ঙ. (৫-৬) বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বিচিত্রার জন্য কবির স্বহস্ত-লিখিত এই প্রেস কপি থেকেই পূর্বোক্ত 'ঘ' এর পাঠ অনুলিখিত।

চ. (২৮৯ - ২৯১) ঐ

ছ. (১৪ - ১৭) ক-এর অনুরূপ।

জ. (১৪ - ১৭) চ-এর অনুরূপ।

১৮। ক. (৪ - ৫) এমন তো একদিনও হয়নি। সকালবেলায় ফুল একটা দিয়ে যেতেন,—সময় হোলো না। জানি জানি আগেকার দিনের কিছুই থাকবে না। আমি থাকব পড়ে আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে নিবে যাওয়া উনুনের পোড়া কয়লা ঝেঁটিয়ে ফেলবার জায়গায়। সে কোন্ দেবতা এমন বিচার যার। (সরলা আসচে দেখে আয়া মুখ বাঁকা করে চলে গেল।)—বন্ধনীর মধ্যেকার নিম্নরেখ বাক্য কবির স্বহস্তে লিখিত।

খ. (৪) এই অংশ নেই।

গ. (১১) ……ফুল একটা দিয়ে যেতে সময় হোলো না। জানি জানি…দিনের আর কিছুই থাকবে না।……নেবা উনুনের…(কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

ঘ. (১২ - গ)—'ক'-এর অনুরূপ। কেবল 'দিনের কিছুই' স্থলে 'দিনের আর কিছুই'।

ঙ. (৬) —'আজ এই প্রথম হোলো। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়লো। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষ কালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা'।

'সে কোন্ দেবতা……বিচার যার'—অংশের উল্লেখ নেই। সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। (কবির স্ব-লিখিত)।

চ. (২৯১) ঐ

ছ. (১৭) ঙ-এর অনুরূপ।

জ. (১৭ - ১৮) ঐ

১৯। ক. (৫) … হাতে তার একটি অরকিড।… দেখবা মাত্র সবচেয়ে লক্ষ্য হয়… নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে।… রেখে দিলে।

খ. (৪) …অরকিড। ফুলটি নির্মল শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগ্নি রেখা, যেন মস্ত একটা প্রজাপতি ডানা মেলেছে।…কাঁধের দিকে নেমে পড়েছে।…রেখে দিলে।

গ. (১১ - ১২) ঐ

ঘ. (১৩) খ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'হাতে তার' স্থলে 'তার হাতে', 'কাঁধের দিকে নেমে পড়েছে' স্থলে 'নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে।' (নিম্নরেখ সংশোধন কবির স্বহস্ত-কৃত)।

ঙ. (৬ - ৭) খ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'নির্মল শুভ্র', স্থলে 'শুভ্র', 'বেগ্নি' স্থলে 'বেগনির' 'যেন মস্ত একটা প্রজাপতি ডানা মেলেছে' স্থলে 'যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি' 'দেখামাত্র সবচেয়ে লক্ষ্য হয়' স্থলে 'প্রথমেই লক্ষ্য হয়,' 'কাঁধের দিকে নেমে পড়েছে' স্থলে 'নেমে পড়েচে কাঁধের দিকে।' 'যেন কেউ আসেনি ঘরে' বর্জিত। 'আস্তে আস্তে' স্থলে 'ধীরে ধীরে'।

চ. (২৯১) ঐ

ছ. (১৮) 'ঙ'-এর অনুরূপ।

জ. (১৭-১৮) ঙ-এর অনুরূপ।

২০। ক. (৬) কাল রাতে তালা ভেঙে

খ. (৪) ঐ

গ. (১২) ঐ

ঘ. (১৩) ঐ

ঙ. (৭) কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে (কবি-কর্তৃক স্ব-লিখিত)।
চ. (২৯১) ঐ
ছ. (১৯) ঐ
জ. (১৮) ঐ

২১। ক. (৬) টানাটানি করে পাঁচ মিনিটও কি···
খ. (৪) (এই অংশ নেই)
গ. (১২) ক-এর অনুরূপ (কবির স্বলিখিত সংযোজন)।
ঘ. (১৪) ঐ
ঙ. (৭) টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও···(কবির স্বলিখিত)।
চ. (২৯১) ঐ
ছ. (১৯) ঐ
জ. (১৮) ঐ

২২। ক. (৬) কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল, ঘুমোতে পার নি।···পড়েছিলে, দরজা পর্যন্ত···গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন তবে এই ফুলটি তোমাকে দিই যেন।
খ. (৪) এই অংশ নেই।
গ. (১২) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'পার নি' স্থলে, 'পারো নি'। (কবির স্বহস্তের সংযোজন)।
ঘ. (১৪) ঐ ।
ঙ. (৭) গ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম : 'বেড়েছিল,' স্থলে 'বেড়েছিল।'; 'ঘুমোতে পারো নি' অংশের উল্লেখ নেই। 'দরজা পর্যন্ত' স্থলে 'দরজার কাছ পর্যন্ত' 'ফুলটি তোমাকে দিই যেন' স্থলে 'ফুলটি যেন দিই তোমাকে' (কবির স্বহস্তে লিখিত)।
চ. (২৯১) ঐ
ছ. (১৯) ঐ
জ. (১৮) ঐ

২৩। ক. (৭) নিশ্চয়ই তাই। আমি জানি নে?
খ. (৫) এই অংশ নেই।
গ. (১৪) ক-এর অনুরূপ। (কবির স্বহস্তে লিখিত)।
ঘ. (১৫) ঐ

ঙ. (৭) নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও আমি জানি নে?—(বিচিত্রার প্রেস কপিতে কবির স্বহস্তে সংযোজন)।

চ. (২৯২) ঐ

ছ. (২০) ঐ ব্যতিক্রম—'বলতে চাও' স্থলে 'বল্‌তে চাও,'।

জ. (১৯) ঐ ব্যতিক্রম—'বল্‌তে' স্থলে 'বলতে'।

২৪। ক. (৯) দিদিমণি, একটা পিতলের ঘটি। কটকের তৈরি। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৬) এই অংশ নেই।

গ. (১৮) এই অংশ নেই।

ঘ. (১৮) ক-এর অনুরূপ।

ঙ. (৯) বৌদিদি, একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। (বিচিত্রার প্রেস কপিতে এই পরিবর্তন সম্ভবত কবির নির্দেশে)।

চ. (২৯৩) ঐ ব্যতিক্রম—'একটা' স্থলে 'এই একটা' (সম্ভবত প্রুফ শীটে কবি-কর্তৃক পরিবর্তিত)।

ছ. (২৩) ঐ

জ. (২১) ঐ

২৫। ক. (৯) এর দাম কত হবে? (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৬) এই অংশ নেই।

গ. (১৮) এই অংশ নেই।

ঘ. (১৮) এর দাম কত?

ঙ. (৯) ঐ

চ. (২৯৩) ঐ

ছ. (২৩) ঐ

জ. (২২) ঐ

২৬। ক. (৯) ···ঐ ঘটির দাম নেব? তোমার খেয়ে পরেই মানুষ! (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৬) এই অংশ নেই।

গ. (১৮) এই অংশ নেই।

ঘ. (১৮) <u>সামান্য</u> এই ঘটির দাম নেব? (নিম্নরেখ শব্দ দু-টি কবির স্বহস্তে লিখিত)।

ঙ. (৯) 'এ ঘটির আবার দাম নেব। গরীব আমি, তা বলে তো ছোটো লোক নই। তোমারই খেয়ে পরে যে মানুষ।'

চ. (২৯৩) ঐ

ছ. (২৩) ঐ

জ. (২২) ঐ

২৭। ক. (৯) (ঘটি টেবিলে রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিলে। যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে) আমার ভাগ্‌নীর বিয়েতে সেই বাজুবন্ধের কথাটা ভুলো না দিদিমণি। পিতলের জিনিষ যদি দিই তাতে তোমারি নিন্দে হবে।— (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৬) এই অংশ নেই।

গ. (১৮) এই অংশ নেই।

ঘ. (১৮) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'দাঁড়িয়ে' স্থলে 'দাঁড়িয়ে বললে', এবং 'পিতলের জিনিষ' স্থলে 'তাকে পিতলের জিনিষ'। ('তাকে' শব্দটি কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

ঙ. (৯) ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল দিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগ্‌নীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বৌদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারি নিন্দে হবে। এত বড়ো ঘরের মালী, তারি ঘরে বিয়ে, দেশ সুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে। (এই পৃষ্ঠা দুবার লেখা। একটিতে এই অংশ কাটা হলেও এই পাঠ রয়েছে। অন্যটিতে সম্ভবত লিপিকরের অনবধানে প্রথম বাক্যে 'ফুলদানি থেকে' স্থলে 'ফুলদানি' লেখা হয়েছে।)

চ. (২৯৩) ঐ ব্যতিক্রম—'ফুল দিয়ে' স্থলে 'ফুল নিয়ে'; 'যাবার মুখো' স্থলে 'যাবার-মুখো'।

ছ. (২৩) ঐ ব্যতিক্রম—'বললে' স্থলে 'বল্‌লে'।

জ. (২২) ঐ ব্যতিক্রম—'বল্‌লে' স্থলে 'বললে'; 'ভাগ্‌নীর' স্থলে 'ভাগ্‌নির'।

২৮। ক. (৯) আচ্ছা আচ্ছা স্যাকরাকে ফরমাস দেব, তুই এখন যা। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৬) এই অংশ নেই।

গ. (১৮) এই অংশ নেই।

ঘ. (১৮) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'আচ্ছা আচ্ছা' স্থলে 'আচ্ছা আচ্ছা,'।

ঙ. (৯) আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।

চ. (২৯৩) ঐ

ছ. (২৪) ঐ

জ. (২২) ঐ

২৯। ক. (১০ - ১১) মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো-মন নয়।…"সব কথারই কি ভাষা আছে?"

খ. (৭) ঐ ব্যতিক্রম—পুরুষদের স্থলে 'পুরুষের'।

গ. (২০) ঐ

ঘ. (১৯-২০) ক-এর অনুরূপ।
ঙ. (১০) ঐ
চ. (৪২৯-৩০) ঐ ব্যতিক্রম—'সব কথারই কি' স্থলে 'সব কথারই'।
ছ. (২৬) ঐ
জ. (২৪) ঐ

৩০। ক. (১১) কেন হতেই পারে না।
খ. (৮) ঐ
গ. (২১) ঐ
ঘ. (২০) ঐ
ঙ. (১০) এই অংশ নেই।
চ. (৪৩০) ঐ
ছ. (২৭) ঐ
জ. (২৪) ঐ

৩১। ক. (১২) বলেছিই তো।
খ. (৮) ঐ
গ. (২১) ঐ
ঘ. (২০) ঐ
ঙ. (১০) বলেইছি তো।
চ. (৪৩০) বলেইছি-তো।
ছ. (২৭) ঐ
জ. (২৪) ঐ

৩২। ক. (১৩) ···তোমরা বাগানের কাজ করতে।···বয়েস পনেরো হবে। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।
খ. (৮) এই অংশ নেই।
গ. (২৩) এই অংশ নেই।
ঘ. (২২) তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে।···বয়সে পনেরো হবে। ('দুজনে' শব্দটি কবির স্বহস্তে সংযোজিত) 'বয়েস' স্থলে 'বয়সে'।
ঙ. (১১) ঐ
চ. (৪৩০) ঐ
ছ. (২৯) ঐ
জ. (২৬) ঐ

৩৩। ক. (১৩) আমি জানতুম ওঁর একটা ডেস্কের মধ্যে ছিল সেখানে থেকে আনিয়ে নিয়েছি।··· (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৮) এই অংশ নেই।

গ. (২৩) এই অংশ নেই।

ঘ. (২২) দেখেছিলুম ওঁর একটা ডেস্কের মধ্যে ছিল তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। (নিম্নরেখ অংশ কবির স্বহস্তে লিখিত)।

ঙ. (১১) ঐ ব্যতিক্রম—'মধ্যে ছিল' স্থলে 'মধ্যে ছিল'

চ. (৪৩১) ঐ ব্যতিক্রম—'ডেস্কের মধ্যে ছিল' স্থলে 'ডেস্কের মধ্যে'।

ছ. (২৯) ঐ

জ. (২৬) ঐ

৩৪। ক. (১৩) তখনকার সরলাকে জানতুম না তাই আমার কাছে এখনকার সরলাই সত্য। (কবির স্বহস্তে সংযোজিত)।

খ. (৮) এই অংশ নেই।

গ. (২৩) এই অংশ নেই।

ঘ. (২২) তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল? অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে? (নিম্নরেখ অংশগুলি কবির স্বহস্তের সংযোজন)।

ঙ. (১১) ঐ

চ. (৪৩১) ঐ

ছ. (২৯) ঐ

জ. (২৬) ঐ

৩৫। ক. (১৩) সরলা, একটু বোসো।—ঠাকুরপো একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে তোমাদের চোখে পড়ে··· (কবির স্বহস্তের সংযোজন)।

খ. (৮) এই অংশ নেই।

গ. (২৩) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—সংলাপে 'সরলা' সম্বোধনটি নেই, 'একটু বোসো' স্থলে 'যেয়োনা বোসো,' 'পুরুষ মানুষের' স্থলে 'তোমার পুরুষমানুষের', 'চোখ দিয়ে' স্থলে 'দৃষ্টি দিয়ে': 'ওর কী' স্থলে 'কী ওর', 'তোমাদের চোখে পড়ে' স্থলে 'তোমার চোখে পড়ে'—(নিম্নরেখা শব্দগুলি কবির স্বহস্তের পরিবর্তন ও সংযোজন)।

ঘ. (২২) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'তোমাদের চোখে পড়ে' স্থলে 'চোখে পড়ে'।—
ঙ. (১১) ঐ
চ. (৪৩১) ঐ ব্যতিক্রম 'রোসো' স্থলে 'বোসো'।
ছ. (৩০) ঐ
জ. (২৭) ঐ

৩৬। ক. (১৪) মিষ্টি করে চাইতে জানে
খ. (১০) এই অংশ নেই
গ. (২৩) ক-এর অনুরূপ (কবির স্বহস্তের সংযোজন)।
ঘ. (২২) গভীর করে চাইতে জানে (কবির স্বহস্তের সংশোধন—'মিষ্টি' কেটে 'গভীর' করেছেন)।
ঙ. (১১) ঐ
চ. (৪৩) ঐ
ছ. (৩০) ঐ
জ. (২৭) ঐ

৩৭। ক. (১৫) রয়ে বসে
খ. (১০) ঐ
গ. (২৫) ঐ
ঘ. (২৩) ঐ
ঙ. (১২) ঐ
চ. (৪৩১) রয়ে সয়ে (মুদ্রিত : সম্ভবত প্রুফ শীট-এ পরিবর্তিত)।
ছ. (৩১) ঐ
জ. (২৮) ঐ

৩৮। ক. (১৬-১৮) রোশনি, শুনে যা···ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।
খ. (১০-১১) এই অংশ নেই।
গ. (২৫) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'খোঁখী' স্থলে 'খোঁকী!'; 'রংমহলের' স্থলে 'তার রংমহলের'; 'ঐ না শুনলেম শব্দ' স্থলে 'ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?' (কবির স্বহস্তের সংযোজন)। এই সমগ্র অংশ সম্পর্কে কবির স্বলিখিত নির্দেশ 'এ অংশটা নাটকের'। 'রমেন চলে গেলে' (পৃঃ ২৫)···দুধ বার্লি স্পর্শ করলে না। (পৃঃ ২৭) —কপির এই দীর্ঘ অংশ সম্পূর্ণ কেটে দিয়ে কবি এটি নূতন সংযোজন করেছেন।
ঘ. (২৬-২৭) গ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'খোকী!' স্থলে 'খোঁখি?'; 'তার রংমহলের' স্থলে

'রংমহলের', 'ঘুমচ্চে তাহলে।' স্থলে 'ঘুমোচ্ছে। তাহলে' (দাঁড়িটি কবি-কর্তৃক স্থানান্তরিত)।

ঙ. (১৩) ঘ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'খেয়ে নাও, লক্ষ্মী তুমি' স্থলে 'খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি তুমি'।

চ. (৪৩২-৩৩) ঙ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'তা হোলে ওদের' স্থলে 'তা হোলে মালিদের', 'লক্ষ্মীটি তুমি' স্থলে 'লক্ষ্মীটি।'

ছ. (৩৪ - ৩৬) ঐ ব্যতিক্রম—'এমন কত রাত্রে ঘুমোইনি' স্থলে 'এমন কত জ্যোৎস্নারাতে ঘুমোইনি' (মুদ্রিত পাঠে এই পরিবর্তন সম্ভবত প্রুফ সংশোধন কালে হয়েছে)।

জ. (৩০) ঐ

৩৯। ক. (১৯) দূরে ঝিলের জল টলমল করছে, জানলা দিয়ে তার কিছুটা দেখা যাচ্চে, নীরজা সেদিকে চেয়ে আছে।

খ. (১১) ঝিলের জল উঠল টলটল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

গ. (২৭) খ-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'মালীরা···দেখে' অংশ কবির স্বহস্তে কাটা।

ঘ. (২৭) ঐ

ঙ. (১৪) ঐ

চ. (৪৩৩) ঐ

ছ. (৩৬) ঐ

জ. (৩০) ঐ

৪০। ক. (১৯) নীরজার গলা জড়িয়ে ধরে ললাটের চুলগুলো সীঁথিতে পাট করে তুলে দিতে দিতে বললে—

খ. (১১) নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে,

গ. (২৮) ঐ

ঘ (২৮) ঐ

ঙ. (১৪) ঐ

চ. (৪৩৩) ঐ

ছ. (৩৭) ঐ

জ. (৩১) ঐ

৪১। ক. (২১) হাঁ বেড়ি দিতেই চাই।

খ. (১২) এই অংশ নেই।

গ. (২৮) হাঁ বেড়ি দিতেই চাই (কবির স্বকৃত সংযোজন)।

ঘ. (২৯) ঐ

ঙ. (১৪) ঐ

চ. (৪৩৪) ঐ

ছ. (৩৮) হাঁ বেড়ি দিতে চাই।
জ. (৩২) ঐ

৪২। ক. (২৩) হাঁ করো, অন্যায় করেছি,
খ. (১২) হাঁ করো, খুব রাগ করো, যত পারো রাগ করো, অন্যায় করেছি,
গ. (৩০) ঐ
ঘ. (৩১) ঐ
ঙ. (১৫) ঐ
চ. (৪৩৪) ঐ
ছ. (৩৯) ঐ
জ. (৩২) ঐ

৪৩। ক. (২৫) পুরুষরা হাড়ে অকেজো।
খ. (১২) এই অংশ নেই।
গ. (৩২) ক-এর অনুরূপ। (উপন্যাসের কপিতে কবির স্বকৃত সংযোজন)।
ঘ. (৩৩) ঐ
ঙ. (১৬) ঐ
চ. (৪৩৫) পুরুষেরা হাড়ে অকেজো—
ছ. (৪১) ঐ
জ. (৩৫) ঐ

৪৪। ক. (২৭) সেই নীম গাছতলায়, সেই কাঁটা গাছের গুঁড়ি।
খ. (১৪) সেই নীমগাছতলায় গাছের গুঁড়ি।
গ. (৩৩) সেই নীম গাছতলা, সেই কাটা গাছের গুঁড়ি (কবির স্বকৃত পরিবর্তন ও সংযোজন)।
ঘ. (৩৪) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'কাঁটা' স্থলে 'কাটা'।
ঙ. (১৭) ঘ-এর অনুরূপ।
চ. (৪৩৬) ঐ
ছ. (৪৩) ঐ
জ. (৩৬) ঐ ব্যতিক্রম—'নীমগাছ' স্থলে 'নিমগাছ' ইত্যাদি।

৪৫। ক. (২৯) পাত্র আছে একদিকে পাত্রী আছে আর একদিকে।
খ. (১৪) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'পাত্রী' স্থলে 'পাত্রীও'।
গ. (৩৪) ঐ
ঘ. (৩৬) ঐ
ঙ. (১৭) ঐ
চ. (৪৩৬) ঐ ব্যতিক্রম—'আর একদিকে' স্থলে 'আর-একদিকে'।

ছ. (৪৪) চ-এর অনুরূপ।
জ. (৩৭) ঐ

৪৬। ক. (৩০) এক্‌স্‌রেজ
খ. (১৪) এক্স্‌রেজ্‌
গ. (৩৫) ঐ
ঘ. (৩৭) ক-এর অনুরূপ।
ঙ. (১৭) ঐ
চ. (৪৩৭) ঐ
ছ. (৪৫) ঐ
জ. (৩৮) ঐ

৪৭। ক. (৩৩) ডুবুডুবু
খ. (১৫) ডুবো-ডুবো
গ. (৩৭) ঐ
ঘ. (৩৯) ঐ
ঙ. (১৮) ঐ
চ. (৪৩৭) ঐ
ছ. (৪৭) ঐ
জ. (৪০) ঐ

৪৮। ক. (৩৪) জানিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে
খ. (১৬) ঐ
গ. (৩৮) ঐ
ঘ. (৪০) ঐ
ঙ. (১৯) ঐ
চ. (৪৩৮) সেয়ানা করে তোলে···। (সম্ভবত প্রুফ সংশোধনকালে পরিবর্তিত)
ছ. (৪৮) ঐ
জ. (৪০) ঐ

৪৯। ক. (৩৫) ও যে ভালোবাসার জিনিষ,
খ. (১৬) ও যে ভালোবাসবার জিনিষ,
গ. (৩৯) ঐ
ঘ. (৪১) ঐ
ঙ. (১৯) ঐ
চ. (৪৩৮) ঐ

ছ. (৪৯) ও যে ভালোবাসবার জিনিষ,
জ. (৪১) ঐ

৫০। ক. (৩৬) এমন লোক তখন কেউ ছিল না।
খ. (১৭) ঐ
গ. (৪০) ঐ
ঘ. (৪২) ঐ
ঙ. (২০) ঐ
চ. (৪৩৮) এমন লোক তখন ছিল না। ('কেউ' শব্দটি বাদ পড়েছে, সম্ভবত প্রুফ সংশোধনে)।
ছ. (৫০) ঐ
জ. (৪২) ঐ

৫১। ক. (৩৬) শুধু কেবল তোমার আমার,
খ. (১৭) ঐ
গ. (৪০) ঐ
ঘ. (৪২) ঐ
ঙ. (২০) ঐ
চ. (৪৩৯) শুধু তোমার আমার, ('কেবল' শব্দ বাদ পড়েছে, সম্ভবত প্রুফ সংশোধনে)।
ছ. (৫০) ঐ
জ. (৪২) ঐ

৫২। ক. (৩৭) কিচ্ছু চাই নে, কিচ্ছু না ;
খ. (১৮) ঐ
গ. (৪২) ঐ
ঘ. (৪৪) ঐ
ঙ. (২০) ঐ
চ. (৪৩৯) কিছু চাইনে, কিচ্ছু না, (সম্ভবত প্রুফ সংশোধনে বদলেছে)।
ছ. (৫২) ঐ
জ. (৪৩) ঐ

৫৩। ক. (৩৮) গুমোর
খ. (১৯) গুমর
গ. (৪৩) ঐ
ঘ. [খণ্ডিত পুঁথি নিঃশেষিত]

ঙ. (২১) ক-এর অনুরূপ

চ. (৪৩৯) ঐ

ছ. (৫৩) ঐ

জ. (৪৪) ঐ

৫৪। ক. (৩৮) বিধাতা যে আমারি দিকে…ধরা পড়েছে।

খ. (১৯) বিধাতা যে আমার দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়চে।

গ. (৪৩-৪৪) ঐ

ঙ. (২১) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম 'পড়েছে'—স্থলে 'পড়ছে'

চ. (৪৩৯) ঐ

ছ. (৫৩) ঐ

জ. (৪৪) ঐ

৫৫। ক. (৩৮) কেন তুলনা করতে এলে

খ. (১৯) ঐ

গ. (৪৪) ঐ

ঙ. (২১) কেন দুজনের তুলনা করতে এলে ?

চ. (৪৪০) ঐ

ছ. (৫৩) ঐ

জ. (৪৪) ঐ

৫৬। ক. (৩৮-৩৯) না গো না,…ভেদ রাখি নি একটুও।

খ. (১৯) না গো,…ভেদ রাখি নি একটুকুও।

গ: (৪৪) ঐ

ঙ. (২১) ঐ ব্যতিক্রম,—'না গো' স্থলে 'না গো না',

চ. (৪৪০) ঐ

ছ. (৫৩) ঐ

জ. (৪৫) ঐ

৫৭। ক. (৪১) শিশুর ঘুম ভাঙা চোখের রাঙা।

খ. (১৯) শিশুর ঘুম ভাঙা চোখের মতো রাঙা।

গ. (৪৬) ঐ

ঙ. [খণ্ডিত প্রেস-কপি নিঃশেষিত]

চ. (৫৯) ঐ

ছ. (৪৬) ঐ

জ. (৪৬) ঐ

৫৮। ক. (৪৫) তোমার এক বাগান ভেঙেছে, এবার হুকুম এল তোমার কপালে আর এক বাগান ভাঙবে।

খ. (২১) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'ভেঙেছে' স্থলে 'ভেঙেচে'; 'আর এক' স্থলে 'আর-এক'।

গ. (৫১) ঐ

চ. (৫৭০) আগেই ভেঙেচে তোমার এক বাগান (সম্ভবত প্রুফ সংশোধনকালে বাক্যটি পরিবর্তিত)—শেষাংশ, ক-এর অনুরূপ।

ছ. ঐ

জ. ঐ

৫৯। ক. (৪৫) সম্রাটবাহাদুর···খোলাসা রাখবেন।

খ. (২২) সম্রাটবাহাদুর···খোলসা রেখে দেবেন।

গ. (৫১) সম্রাটবাহাদুর···খোলসা করে দেবেন।

চ. (৫৭০) সম্রাটবাহাদুর···খোলাসা রাখবেন।

ছ. (৬০) ঐ

জ. (৫০) সম্রাট বাহাদুর···খোলসা রাখবেন।

৬০। ক. (৪৬) একটা কথা···স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

খ. (২২) ঐ ব্যতিক্রম 'উঠেছে' স্থলে 'উঠচে'

গ. (৫১) ঐ

চ. (৫৭১) ঐ

ছ. (৬১) একটা কথা···স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

জ. (৫০) ঐ ব্যতিক্রম 'উঠেছে' স্থলে 'উঠছে'

৬১। ক. (৪৭) যেন মিললুম,

খ. (২৩) ঐ

গ. (৫৩) ঐ

চ. (৫৭১) যেন ফিরলুম

ছ. (৬২) যেন ফিরলুম

জ. (৫১) ঐ

৬২। ক. (৫৭) কোমরে বাঁধা ঝুলি থেকে বের করলে পাঁচটি নাগেশ্বর ফুলের একটি ছোটো তোড়া

খ. (২৮) কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু না কিছু সংগ্রহ করার দরকার

হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল।

গ. (৬৩) ঐ
চ. (৫৭৪) ঐ
ছ. (৭০) ঐ
জ. (৫৮) ঐ

৬৩। ক. (৫৯) একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। রমেন পত্রখানি পড়তে লাগল।
খ. (২৯) একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে।
গ. (৬৫) ঐ
চ. (৫৭৫) ঐ
ছ. (৭৩) ঐ
জ. (৬০) ঐ

৬৪। ক. (৬০) এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার হয়েছে,
খ. (৩০) এই প্রশ্নই বার বার আমার মনে হয়েছে,
গ. (৬৭) ঐ
চ. (৫৭৬) ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম—'হয়েছে' স্থলে 'উঠেছে'
ছ. (৭৫) ঐ ব্যতিক্রম—'উঠেছে' স্থলে 'উঠেচে'।
জ. (৬১) চ-এর অনুরূপ।

৬৫। ক. (৬২) আমার কি একটা নাম ছিল?
খ. (৩১) ঐ
গ. (৬৯) আমার কি একটা নাম ছিল।
চ. (৫৭৬) আমার কি একটাই নাম ছিল?
ছ. (৭৬) ঐ
জ. (৬৩) ঐ ব্যতিক্রম—'?'-চিহ্ন স্থলে '!' চিহ্ন।

৬৬। ক. (৬৩) আমার এই কাঙাল নৈরাশ্য।
খ. (৩২) ঐ
গ. (৭০) ঐ
চ. (৫৭৭) ঐ
ছ. (৭৭) আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা (সম্ভবত প্রুফ সংশোধনকালে পরিবর্তিত)।
জ. (৬৩) ঐ

৬৭। ক. (৬৫) আমার মন ছোটো।
খ. (৩৩) ঐ
গ. (৭২) ঐ
চ. (৫৭৭) আমার মন বিশ্রী ছোটো।
ছ. (৭৯) ঐ
জ. (৬৫) ঐ

৬৮। ক. (৬৬) কিছুতেই হাত রাখলেম না,
খ. (৩৩) কিছুতেই হাতে রাখলেম না,
গ. (৭৩) কিছুই হাতে রাখলেম না,
চ. (৫৭৮) ঐ
ছ. (৮০) ঐ
জ. (৬৬) ঐ

৬৯। ক. (৭৩) এ মালা কতকাল পরেছি
খ. (৩৬-৩৭) এ মালা এতকাল পরেছি
গ. (৭৮) ঐ
চ. (৫৮০) এ মালা কতবার পরেছি
ছ. (৮৭) ঐ
জ. (৭১১) ঐ

৭০। ক. (৭৫) ভাগ্য যার থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে ;
খ. (৩৭) ঐ
গ. (৮০) ঐ
চ. (৫৮১) ঐ
ছ. (৮৮) ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে,
জ. (৭২) ঐ

৭১। ক. (৭৮) আর একটা শাখা বাড়াব
খ. (৩৯) ঐ
গ. (৮২) ঐ
চ. (৫৮২) ঐ ব্যতিক্রম—'বাড়াব' স্থলে 'বাড়বে'।
ছ. (৯০) ঐ ব্যতিক্রম—'বাড়বে' স্থলে 'বাড়্‌বে'।
জ. (৭৪) চ-এর অনুরূপ।

৭২। ক. (৮০) যারা আমায় পছন্দ করে না তারা নিন্দে করবে বই কি।
খ. (৩৯) যারা আমাকে পছন্দ করে না তারা নিন্দে করবে বই কি।
গ. (৮৩) ঐ
চ. (৫৮২) যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বই কি।
ছ. (৯১) ঐ
জ. (৭৫) ঐ

৭৩। ক. (৮২) অরক্ষণীয়া না হোলে
খ. (৫১) ঐ ব্যতিক্রম—'হোলে' স্থলে 'হলে'।
গ. (৮৫) ঐ
চ. (৫৮৩) অরক্ষণীয় না হলে
ছ. (৯৩) ঐ ব্যতিক্রম—'হলে' স্থলে 'হোলে'।
জ. (৭৬) চ-এর অনুরূপ।

৭৪। ক. (৮৫) আর ফিরে তাকাবে না?
খ. (৪১) আর ফিরে তাকাবে না এখন?
গ. (৮৭) ঐ
চ. (৫৮৪) ঐ
ছ. (৯৫) ঐ
জ. (৭৮) ঐ

৭৫। ক. (৮৭) ষড়যন্ত্র করে বড়োলাটের
খ. (৪৩) ষড় করে বড়োলাটের
গ. (৮৯) ঐ
চ. (৫৮৪) ঐ
ছ. (৯৭) ঐ
জ. (৭৯) ঐ

৭৬। ক. (৯৮) আর এগোয় নি।
খ. (৪৮) আর এগোই নি।
গ. (১০১) ঐ
চ. (৫৮৭) ক-এর অনুরূপ।
ছ. (১০৬) ঐ
জ. (৮৬) খ-এর অনুরূপ।

১৭। ক. (১০১) সেইদিনই গুণছি।
খ. (৫০) সেইদিন গুণ্‌চি।
গ. (১০৪) ঐ
চ. (৫৮৯) ঐ ব্যতিক্রম—'গুণ্‌চি' স্থলে 'গুণছি'।
ছ. (১০৯) ঐ
জ. (৮৯) ঐ

১৮। ক. (১০১) নী—ও কী, ও কার চিঠি ?
আ—(একটু চুপ করে থেকে) টেলিগ্রাম এসেছে।
নী—কিসের টেলিগ্রাম ?
আ—মেয়াদ শেষ হবার আগেই সরলা ছাড়া পেয়েছে।
নী—ছাড়া পেয়েছে ? দেখি। (টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে)
তা হোলে তো আর দেরি নেই। এখনি আসবে।
ওকে নিশ্চয় এনো আমার কাছে। (বলতে বলতে মূর্চ্ছার উপক্রম)
খ. (৫০) সরলা [নীরজা] জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর। (এই প্রশ্ন কবি ভুলে সরলার মুখে লিখেছেন মনে হয়।)···জেল থেকে বেরলেই নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।"
গ. (১০৫) প্রথমাংশ খ-এর অনুরূপ। শেষাংশ 'জেল থেকে বেরলেই' স্থলে 'তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে।'—কবি কর্তৃক সংশোধিত পাঠ। সর্ব শেষ অংশে "নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।" খ-এর অনুরূপই আছে।
চ. (৫৮৯) ঐ ব্যতিক্রম—"নিশ্চয়ই" শব্দ বর্জন।
ছ. (১১০) ঐ
জ. (৮৯-৯০) ঐ

১৯। ক. (১০৩) ভৃত্যের প্রবেশ।
ভৃত্য (আদিত্যের কানে কানে) সরলা দিদিমণি এসেচেন। (আদিত্যের প্রস্থান। ও সরলাকে নিয়ে প্রবেশ)—কবির স্বহস্তের সংযোজন কেবল নাটকের কপিতে ; অন্যত্র নেই।

দ্রষ্টব্য : 'ঐ' শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্বে লিখিত পুঁথির পাঠ নির্দেশ করা হল ; অব্যবহিত পূর্বের ছত্রে ব্যতিক্রমের উল্লেখ থাকলে, ব্যতিক্রম-সহ উল্লিখিত পাঠ বুঝতে হবে।

মালতী-পুঁথির পরিশিষ্ট

ভূমিকা

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে মালতী-পুঁথির পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার প্রাক্তন সম্পাদক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-কৃত উক্ত পুঁথির টীকা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত মালতী-পুঁথি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব-প্রদত্ত তথ্যপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে। মালতী-পুঁথির সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় সাধনে এগুলি অনেকখানি সহায়ক হবে বলে মনে করি। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ পুঁথির পূর্ণতর পরিচয় দানের জন্য আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ-কাজ শ্রমসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। কেননা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যসাধনার বহু বিচিত্র নিদর্শন এই পুঁথিটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের সবগুলির সূত্রানুসন্ধান সহজ নয়।

কবির বালকবয়সের সাহিত্যসাধনার নিত্যসঙ্গী সেই বাঁধানো নীল খাতা, কিংবা তার পরবর্তী লেট্‌স ডায়ারি বহুপূর্বেই হারিয়েছে। আজ পর্যন্ত আমরা তাঁর যতগুলি পাণ্ডুলিপি পেয়েছি তাদের মধ্যে ৭৬ পৃষ্ঠার এই খণ্ডিত মালতী-পুঁথিটিই সবচেয়ে পুরোনো। তখনকার সাহিত্যপত্রে কিংবা তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থে কিশোর কবির যে-সকল রচনা মুদ্রিত হয়েছিল তাদের অনেকগুলির প্রাথমিক রূপ এই পুঁথিতে ধরা পড়েছে। সেই হিসাবে একে তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যসাধনার আকরগ্রন্থ বলা যায়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সের মানসিক বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে মালতী-পুঁথির অনুশীলন অপরিহার্য। এই কারণে আমরা নানা দিক্ থেকে যথাসাধ্য তথ্য আহরণ করে মালতী-পুঁথির পরিশিষ্ট রচনায় ব্রতী হয়েছি। আহৃত সকল তথ্য পত্রিকার একটি সংখ্যায় নিঃশেষে পরিবেষণ করা সম্ভব নয়,—একাধিক সংখ্যায় সেগুলি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে।

মালতী-পুঁথির কবিতাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মৌলিক কবিতা ও অনুবাদ-কবিতা। এদের মধ্যে মৌলিক কবিতার দাবি স্বভাবতই অগ্রে, যদিও অনুবাদ-কবিতাগুলির গুরুত্বও কম নয়। অনুবাদ-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের তথ্যানুসন্ধানের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, তবে মৌলিক কবিতা-সংক্রান্ত তথ্য-আহরণ মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কাজটি দুরূহ। এর সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হচ্ছে এই যে মালতী-পুঁথির অনেক কবিতা সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংযোজিত হয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতার অংশবিশেষ পরিবর্জিত ও রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। কখনও কবিতার পঙ্‌ক্তিসজ্জায় পরিবর্তন ঘটেছে, আবার কখনও একই রচনা থেকে একাধিক কবিতার সৃষ্টি হয়েছে।

মালতী-পুঁথির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কবিজীবনের কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য বিচার করে অনুমিত হয় শৈশব-সংগীতের কবিতা রচনার সময় থেকে—অর্থাৎ কবির তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকে—তিনি এই খাতাটি ব্যবহার করে এসেছেন। এর পর 'বালক' পত্রিকার ১২৯২ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবসাদ' কবিতাকে ভিত্তি ক'রে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন যে অন্তত কবির চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত খাতাখানি তাঁর কাছেই ছিল। তথ্যানুসন্ধানের সময় উল্লিখিত কাল-সীমার মধ্যে প্রকাশিত কবির বিভিন্ন গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এদের কোন্ গ্রন্থে পুঁথির

কোন্ কবিতা অথবা কোন্ কোন্ কবিতা যথাযথ অথবা পরিবর্তিত আকারে মুদ্রিত হয়েছে, তা বিশদভাবে দেখাবার উদ্দেশ্যে মালতী-পুঁথির প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলিকে সেইসব গ্রন্থানুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে এ-সব কবিতা সেকালের যে-সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পাদটীকায় তাদের উল্লেখ আছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের পাঠান্তরও নির্দেশিত হয়েছে।

পরিশিষ্টের বর্তমান পর্যায়ে এ-কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের ওই সময়কার সাতখানা বই বেছে নেওয়া হয়েছে। নিম্নে তাদের তালিকা প্রদত্ত হল :

১ শৈশব সঙ্গীত

২ কবিকাহিনী

৩ ভগ্নহৃদয়

৪ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

৫ রুদ্রচণ্ড

৬ সন্ধ্যাসঙ্গীত

৭ বউ-ঠাকুরানীর হাট

পরিশেষে বক্তব্য এই যে রবীন্দ্র-ভবনের শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবকে আমরা এ-কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'তথ্যপঞ্জী' অনেকের কাছেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এইসঙ্গে প্রকাশিত তথ্যসংকলনে পাঠকবর্গ তাঁর অধিকতর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রমাণ পাবেন বলে আশা করি।

তথ্য-সংকলন

শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪)

শৈশব সঙ্গীত-গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে তিনটির সম্পূর্ণ এবং তিনটির আংশিক খসড়া মালতী-পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে।

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার পৌর্বাপর্য যথাযথ রক্ষিত না-হওয়াতে এবং সকল স্থলে রচনার তারিখ না-থাকাতে কোন্ রচনার পরে কোনটি যাবে তা স্থির করা কঠিন। এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে একটি কালক্রম স্বীকার করে নিতে হয়েছে .

(ক) যে-ক্ষেত্রে রচনার তারিখ পাওয়া গিয়েছে সে-ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থে নির্দিষ্ট রচনা-বিন্যাসের পৌর্বাপর্য রক্ষা না করে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত তারিখই গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) যে-ক্ষেত্রে পত্রিকায় ও গ্রন্থে মুদ্রণের তারিখ পাওয়া গিয়েছে সে-ক্ষেত্রে দুই প্রকাশস্থলে প্রাপ্ত তারিখের মধ্যে যে তারিখটি পূর্ববর্তী সেটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) কোনো স্থলে রচনার তারিখ ও কোনো স্থলে পত্রিকা বা গ্রন্থের তারিখের সহযোগে যে কালক্রম প্রস্তুত করা গিয়েছে সেই অনুসারেই রচনাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে।

উল্লিখিত কালক্রম অনুসারে শৈশব সঙ্গীতের রচনার পৌর্বাপর্য এইরূপ :

সম্পূর্ণ

১ অতীত ও ভবিষ্যৎ। ৫৪/২৮ খ, ৫৭/৩০ ক
পাণ্ডুলিপিতে রচনা-তারিখ মঙ্গলবার ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭
ভারতীতে প্রকাশিত হয় নি।

২ প্রতিশোধ (গাথা)। ৬৩/৩৩ ক, ৬৪/৩৩ খ, ৬৫/৩৪ ক
ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ. ১৬৫ ৭০

৩ লীলা (গাথা)। ৬৬/৩৪ খ, ৩৩/১৮ ক, ৩৪/১৮ খ
ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ. ২৮৫-৮৮

আংশিক

৪ ফুলবালা "গান" অংশ। ২৪/১৩ খ
ভারতী, কার্তিক ১২৮৫, পৃ. ৩০৬

৫ অপ্সরা-প্রেম (গাথা)। ৬৭/৩৫ ক, ৬৮/৩৫ খ
ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ. ৫১৪-১৭

৬ ভগ্নতরী "গান" অংশ। ৭০/৩৬ খ
ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬, পৃ. ১২৪-২৫

শৈশবসঙ্গীত[1]

[অতীত ও ভবিষ্যৎ]

পাণ্ডু. পৃ. ৫৪/২৮খ

কেমন গো, আমাদের, ছোট এ[2] কুটীর খানি ;
সুমুখে[3] নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার, বট অশথের ছায়া,
সামনে বকুল গাছ গুলি !
সারাদিন হুহু করি, বহিছে নদীর বায়ু
ঝর ঝর দুলে গাছপালা,
ভাঙ্গাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটি[4] করিয়াছে আলা !
ওদিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দুচারিটি গরু[5]
চিবায় নবীন তৃণদল।
কেহবা গাছের ছায়ে, কেহবা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল ॥

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৩৪ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫০

পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম শৈশবসঙ্গীত। শিরোনামের পাশেই আছে রচনার স্থান ও কাল :

বোটে লিখিয়াছি—মঙ্গলবার/২৪ আশ্বিন/১৮৭৭ [৯ অক্টোবর, ১২৮৪]

রচনার প্রায় সাত বৎসর পরে শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থের (২৯ মে, ১৮৮৪) দ্বিতীয় কবিতারূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ শিরোনামে উক্ত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন :

"এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

কিন্তু আলোচ্য 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতার রচনা-তারিখে কবির বয়স ১৬ বৎসর ৫ মাস ; কাজেই শৈশবসঙ্গীত পর্যায়ের প্রথম কবিতাটির রচনাকাল দাঁড়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বা ১২৮১ বঙ্গাব্দের কোনো এক সময়। শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে সে-যে কোন্ কবিতা তা সহজে জানবার উপায় নেই।

টীকা : মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মুদ্রিত গ্রন্থে শিরোনাম : অতীত ও ভবিষ্যৎ
২ সে
৩ সমুখে
৪ ফুটে
৫ গাভী

পাণ্ডু. পৃ. ৫৪/২৮খ

ওগো[১] কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলেবেলা
এইখানে[২] করেছি যাপন,
সেদিন পড়িলে মনে, প্রাণ যেন কেঁদে উঠে
হুহু কোরে উঠে শূন্য[৩] মন।
নিশীথে নদীর পরে, ঘুমায়ে[৪] পড়েছে[৫] চাঁদ
সাড়া শব্দ নাই চারি পাশে,
[এক]টি দুরন্ত ঢেউ, জাগেনি নদীর কোলে
পাতাটিও নড়েনি বাতাসে
[ত]খন যেমন ধীরে, দূর হোতে দূরপ্রান্তে
নাবিকের বাঁশিরীর[৬] গান
[ধরি] ধরি করি সুর, না পারে ধরিতে[৭] মন,
হুহু করি উঠে গো পরাণ।[৮]
[কি] যেন হারায়ে গেছে[৯], কি যেন[১০] নাপাই খুঁজে
কি কথা গিয়াছি[১১] যেন ভুলে,
কি কু স্বপন সম, মরমের মরমেতে[১২]
কি যেন কি[১৩] জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান
আঁধার মরমে তার[১৪] জাগি উঠে[১৫] প্রতিধ্বনি
কাঁদি উ[ঠে][১৬] আ]কুল পরাণ।
[হা]দেবী[১৭] [তেমনি য]দি, থাকিতাম চিরকাল
[না ফুরাত সেই] ছেলে বেলা
[হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থলথল
মরমেতে তরঙ্গের খেলা]

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ ৩৩-৩৫ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫০-৪৭১

টীকা: মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ জানত
২ সেইখানে
৩ ওঠে যেন
৪ ঘুমিয়েছে
৫ ছায়া
৬ বাঁশরীর : প্রথমে 'বাঁশির উচ্ছ্বাস' ছিল। পরে 'উচ্ছ্বাস কেটে 'গান' লিখেছেন। 'বাঁশির' শব্দটিকে 'বাঁশরীর' করতে গিয়ে 'বাঁশিরীর' থেকে গিয়েছে।
৭ ধরিতে না পারে
৮ উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ!
৯ হারান' ধন
১০ কোথাও
১১ গিয়েছি
১২ বিস্মৃতি, স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে
১৩ আধ স্মৃতি
১৪ মরম মাঝে
১৫ জেগে ওঠে
১৬ কেঁদে ওঠে
১৭ হা দেবি

পাণ্ডু. পৃ. ৫৪/২৮খ

ঘুম ভাঙ্গা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল উষা
ফেলেন গো[১] সুরভি নিশ্বাস,
ঢেউগুলি জাগি উঠি[২], পুলিনের কানে কানে
মৃদু কথা কহে ফুস্‌ফাস্‌[৩]।
তেমনি উঠিত হৃদে, প্রশান্ত সুখের উর্ম্মি
অতি মৃদু অতি সুশীতল
বহিত সুখের শ্বাস ; নাহিয়া শিশির জলে
ফেলে যথা কুসুম সকল।
অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্নে আহা[৪],
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার, শ্রান্ত বালকের মত
পড়ে থাকে সুনীল সলিলে।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকেনা পাখী
একটুও বহেনা বাতাস।
তেমনি কেমন এক, গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদে জাগাইত[৫] দীর্ঘশ্বাস।
এইরূপ কত কিযে, হৃদয়ের ঢেউখেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া
মরমের ঘুমঘোরে, কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া খুসিয়া।
বনের পাখীর মত, অনন্ত আকাশ তলে
গাহিতাম অরণ্যের গান,
আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৩৫-৩৭, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫১ ৫২

টীকা : মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ফেলে ধীরে

২ জেগে ওঠে

৩ কহে তার মরমের আশ।

৪ সায়াহ্ন কালে

৫ হৃদয়ে তুলিত

পাণ্ডু. পৃ. ৫৪/২৮খ

এত দিনে পরে আজ, অয়িগো কল্পনা দেবী[১]
কি হল আমার[২] দুরদশা
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা
ভবিষ্যতে দারুণ দুরাশা[৩]।
যেনরে আমারি ঘোর মনের আঁধার ছায়া[৪]
ঢাকিয়াছে সমস্ত ধরণী[৫]
এই যে বাতাস বহে, আমারি মর্ম্মের যেন[৬]
দুখনিশ্বাসের প্রতিধ্বনি[৭]
যেনরে এ জীবনের আঁধার সমুদ্রে আমি[৮]
ভাসায়ে দিয়াছি[৯] জীর্ণ তরি
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি।
সে [দিকে] ফিরায়ে আঁখি, এখনো দেখিতে [পাই]
[ছায়া ছায়া কাননের রেখা,]

পাণ্ডু. পৃ. ৫৭/৩০ক

নানা বর্ণময়[১০] মেঘ, মিশেছে বনের শিরে
এখনো ওইযে[১১] যায় দেখা
যেতেছি যেখানে ভাসি, সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুইত নাপাই উদ্দেশ।
আঁধার তরঙ্গরাশি অকূল[১২] দিগন্তে মিশে
উনমত্ত অকূল অশেষ।[১৩]
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি, একাকী যাইবে ভাসি,
যতদিনে ডুবিয়া না যায়
হুহু করি ববে বায়ু, গর্জ্জিবে উন্মত্ত উর্ম্মি[১৪]
ঝক মকি[১৫] বিদ্যুত শিখায়

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৩৭-৩৮, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩

টীকা : মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ প্রভাত এখনো আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
২ আমার এমন
৩ একি রে কুয়াশা!
৪-৭ ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে নেই
৮ যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
৯ দিয়েছি
১০ বরণের
১১ বুঝিরে
১২ সলিল রাশি সুদূর
১৩ কোথাও না দেখি তার শেষ!
১৪ সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
১৫ শিহরিছে

[প্রতিশোধ/গাথা][1]

পাণ্ডু. পৃ. ৬৩/৬৩ক

গভীর রজনী—নীরব ধরণী।
মুমূর্ষু পিতার কাছে—
বিজন আলয়ে—আঁধার হৃদয়ে
বালক দাঁড়ায়ে আছে।
বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো
শোণিত বহিয়া[২] যায়—
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়।
পোড়েছে[৩] দীপের অফুট আলোক
আঁধার মুখের পরে—
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে।
দেখিছে—পিতার নীরব[৪] অধরে
যেন অভিশাপ লিখা—
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
হিংসার[৫] অনল শিখা!
ঘুম হোতে[৬] যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া
সুধীর গভীর স্বর।
"শোন্ তবে বৎস[৭]—অধিক কি কব—
আসিছে মরণ বেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
করিস্‌নে[৮] অবহেলা—"

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ. পৃ. ১৬৫-৬৬ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৪২-৪৩ ; অথবা রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৫৬

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম নেই।
২ বহিয়ে
৩ পড়েছে : শৈশবসঙ্গীত
৪ অসাড়
৫ রাগের : ভারতী। রোষের : শৈশবসঙ্গীত
৬ হ'তে
৭ শোনো বৎস শোনো
৮ না করিবে

পাণ্ডু. পৃ. ৬৩/৬৩ক

এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
ছুরিকা হৃদয় হোতে
ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বাসে[১] অমনি
শোণিত বহিল স্রোতে।—
কহিলা[২]—"এই নে—এই নে ছুরিকা—
তাহার উরস পরে—
যতদিন ইহা ঘুমাতে না[৩] পায়
থাকে যেন তোর করে
হা হা—ক্ষত্রদেব কি পাপ কোরেছি[৪]
এ তাপ সহিনু কাহে[৫]—
ঘুমাতে ঘুমাতে শয্যায় পড়িয়া[৬]
মরিতে হইল যাহে।[৭]
কুমার—কুমার—এই নে—এই নে[৮]
পিতার কৃপাণ তোর[৯]
এর অপমান করিস্‌নে যেন[১০]
এই শেষ কথা মোর[১১]।"
নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুন
কথা হোয়ে[১২] গেল রোধ
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে
"প্রতিশোধ"—"প্রতিশোধ"—
পিতার চরণ [পরশ করিয়া]
ছুঁইয়া কৃপাণ খানি
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিলা প্রতিজ্ঞা[১৩] বাণী

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৬; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৪৩-৪৪; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ উছসি
২ কহিল
৩ ঠাঁই নাহি
৪ করেছি
৫ সহিতে হ'ল
৬ বিছানায় পড়ি
৭ জীবন ফুরায়ে এল।
৮-১১ ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে নেই
১২ হয়ে: শৈশবসঙ্গীত
১৩ কহিল শপথ

পাণ্ডু. পৃ. ৬৩/৩৩ ক

"ছুঁইনু কৃপাণ—প্রতিজ্ঞা[১] করিনু
শুন ক্ষত্র-কুল প্রভু
এর প্রতিশোধ—তুলিব—তুলিব—
অন্যথা নহিবে কভু।
সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিশ্রাম[২] পাবে
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।"
রাখিলা শোণিতে মাখা[৩] সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ
মুদিয়া আইল[৪] আঁখি!

—॥—

ভ্রমিছে কুমার—প্রতি[৫] দেশে দেশে
ঘুচাতে প্রতিজ্ঞা[৬]-ভার
দেশে দেশে—ভ্রমি তবুও ত আজি
পেলেনা সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে রোয়েছে[৭] ছুরিকা[৮]
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে
এখনো পিতার শেষ কথাগুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
"কোথা যাও যুবা যেওনা যেওনা
গহন কানন ঘোর—
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী
এসগো কুটীরে মোর।"

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী. ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৬-৬৭, শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৪৪-৪৫ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৫৮

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ শপথ
২ বিরাম
৩ শোণিত-মাখা
৪ পড়িল
৫ কত
৬ শপথ
৭ ছুরিকা
লুকানো

পাণ্ডু. পৃ. ৬৩/৩৩ ক

"ক্ষমগো আমারে[১] কুটীর স্বামী—
বিরাম আলয় চাইনা[২] আমি
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়
সে কাজ পালিব আগে।"
"শুনগো পথিক যেওনা কো আর
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার
দেখেছ চাহিয়া ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগন ভাগে!"
কতনা ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীক হিয়া।

পাণ্ডু. পৃ. ৬৪/৩৩ খ

[চলেছে গহন গিরি নদী মরু
কোন বাধা] নাহি মানি
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা[৩]বাণী!
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ
শুনগো কুটীর স্বামী
খুলে দাও দ্বার দাও গো আশ্রয়[৪]
এসেছি অতিথি আমি!"
ধীরে[৫] ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার
পথিক দেখিল চেয়ে
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৭; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৪৫-৪৬ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৫৮

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ আমায়

২ চাহিনা: শৈশবসঙ্গীত

৩ শপথ

৪ আজিকার মত

৫ অতি

পাণ্ডু. পৃ. ৬৪/৩৩ খ

এলোথেলো চুলে বনফুলমালা
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে করুণা[১]—অধরে মাথানো
কোমল[২] সরল হাস।
বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
পরণ[৩] আসন পরি,
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন কুটীরে
পথিক করিছে বাস ?
কি কর যুবক—ছাড় এ কুটীর
সময় যেতেছে চলি
যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়
সে কাজ যেওনা ভুলি !
বালিকার সাথে বেড়ায় পথিক[৪]
বন-নদী-তীর পানে[৫]
প্রেম গান গাহি—প্রেমের প্রলাপ[৬]
কহি তার কানে কানে।[৭]
কহিত তাহারে সমর-কাহিনী[৮]
সভয়ে শুনিত বালা[৯]
কাহিনী ফুরালে যতন করিয়া[১০]
গলায় পরাত মালা।[১১]

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৭ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৪৬-৪৭ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মমতা

২ কেমন : ভারতী

৩ কুশের

৪-১১ ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে নেই।

পাণ্ডু. পৃ. ৬৩/৩৩খ

দিবসের পর যেতেছে দিবস
যেতেছে বরষ মাস
যুবার হৃদয়ে জড়ায়ে[১] পড়িছে[২]
ক্রমেই প্রণয়-পাশ।[৩]
ক্রমশঃ যুবার ছুরিকা হইতে[৪]
রক্ত চিহ্ন গেল ঘুচি[৫]
শোণিতে লিখিত প্রতিজ্ঞা[৬] আখর
মন হোতে[৭] গেল মুছি।

—॥—

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজিকে[৮] বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে।
মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কানন বাসীরা যত
গাইছে নাচিছে হরষে সকল[৯]
যুবক রমণী শত।
কেহ বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা
গাহিছে বনের গান
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
উপহার করে দান।[১০]
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতি
এলায়ে কুন্তল রাশি[১১]
সুখের আভায় উজলে নয়ন
অধরে সুখের হাসি।[১২]

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৭-৬৮; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৪৭-৪৮, অথবা রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৫৯-৬০

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ পড়িছে
২ জড়ায়ে
৩ শৈশবসঙ্গীতে পরবর্তী চার ছত্রের বিন্যাসক্রম: ৩, ৪, ১, ২
৪ ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
৫ কেন রে গেলনা ঘুচি
৬ শপথ
৭ হতে
৮ আজি: ভারতী
৯ গাহিছে…সকলে
১০ হরষে করিছে দান
১১ চিকুর পাশ
১২ হাস

পাণ্ডু. পৃ. ৬৪/৩৩খ

আইল কুমার বিবাহ সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।
ওকি ও—ওকি ও—সহসা প্রতাপ
বসনে নয়ন চাপি
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর করি[১] কাঁপি
মালতী বালিকা পড়িল সহসা
মূরছি কাতর রবে!
বিবাহ সভায় যত ছিল লোক[২]
ভয়ে পলাইল সবে!
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত আঁখি দু'টা জ্বলে[৩]
শোণিতে মাখান কায়া।
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার
ভয়ে হোল কথা রোধ—
জলদ-গভীর স্বরে কে কহিল
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।—"
"হারে কুলাঙ্গার—কি কাজ করিলি[৪]
প্রতিজ্ঞা ভূলিলি নাকি?[৫]
কার দুহিতারে করিস্ বিবাহ[৬]
আজিকে জানিস্ তা কি?[৭]

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৮; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৪৮-৪৯ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬০-৬১

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ থর
২ ছিল যারা যারা
৩ দুনয়ন জ্বলে : ভারতী; জ্বলে দু নয়ন : শৈশবসঙ্গীত
৪ অক্ষত্র সন্তান
৫ এই কিরে তোর কাজ?
৬ শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
৭ বিবাহ করিলি আজ।

পাণ্ডু. পৃ. ৬৪/৩৩খ

ক্ষত্র ধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন
    হয়[১]—কুলাঙ্গার—তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
    সে আজ্ঞা পালিতে হবে।[২]
নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
    দহিবে এ মোর ক্রোধ।
নীরব সে গৃহে[৩] ধ্বনিল আবার
    "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—"

পাণ্ডু. পৃ. ৬৫/৩৪ক

বুকের বসন হইতে কুমার
    ছুরিকা লইল খুলি
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
    সে ছুরি ধরিল তুলি—
অধীর হৃদয় পাগলের মত
    থর থর কাঁপে পাণি—
কত বার ছুরি ধরিল সে বুকে
    কত বার নিল টানি।
মাথার ভিতর[৪] ঘুরিতে লাগিল
    আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
    "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"
ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ
    মালতী উঠিল জাগি
চারিদিকে চেয়ে বুঝিতে নারিল
    এ সব কিসের লাগি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৯, শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৫০-৫১ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬১

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ওরে: শৈশবসঙ্গীত

২ পালিবি কবে

৩ গৃহ

৪ ভিতরে

পাণ্ডু. পৃ. ৬৫/৩৪ক

কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে—
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।—
"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জনপ্রাণী—
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী—
চাহি চারিদিকে দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হোতে—
শোণিত বহিছে—শয়ন তাঁহার
ভাসিছে[১] শোণিত স্রোতে।
কহিলেন পিতা—"অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
করিস্‌নে[২] অবহেলা।"
হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে—
সে অবধি সেই[৩] বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে—
করিনু প্রতিজ্ঞা[৪] ছুঁইয়া কৃপাণ
"শুন ক্ষত্রকুল প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
অন্যথা নহিবে[৫] কভু!"

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৯ শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৫১-৫২ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬২

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ভাসিল : ভারতী

২ না করিবি

৩ এই

৪ শপথ

৫ না হবে অন্যথা

পাণ্ডু. পৃ. ৬৫/৩৪ক

কি তাহার নাম[১]—জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম—
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
"প্রতাপ তাহার নাম!
এখনি—এখনি—ওই ছুরি তব—
বসাইয়া দেও বুকে—
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
কব তাহা একমুখে।
নিবা[ও সে] জ্বালা—নিবা[ও সে জ্বালা][২]
দাও তার প্রতিফল
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল!"
কাঁদিয়া উঠিল মালতী—কহিল
পিতার চরণ ধোরে[৩]—
"ও কথা—বোলোনা—বোলোনা[৪] গো পিতা
যেওনা ছাড়িয়া[৫] মোরে!—
কুমার—কুমার—শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি—
রাখ মোর কথা—ক্ষমহ[৬] পিতারে
দুখিনী আমার লাগি!
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি—
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধায়ে[৭]
এই পেতে দিনু হৃদি!

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৯-৭০ শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৫২-৫৩ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৬৩

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ নাম কি তাহার: (গ্রন্থ)

২ নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা

৩ ধরে

৪ বলোনা—বলোনা

৫ ছাড়িয়ে

৬ ক্ষম গো

৭ বিঁধিয়া

পাণ্ডু. পৃ. ৬৫/৩৪ক

আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে—
"ক্ষমা কর পিতা পারিব না আমি
কহিতেছি সকাতরে।—
অতি নিদারুণ অনুতাপ-শিখা
দহিছে যে হৃদিতল
সে হৃদয় মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বলগো কি হবে ফল ?
অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা
রাখ এই অনুরোধ—"
নীরব সে গৃহ[১] ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—"
হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার
পাগলের মত যেন।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইলা[২] বলে—
মালতী বালিকা মূৰ্চ্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে।
উন্মত্ত হৃদয়ে জ্বলন্ত নয়নে
বদ্ধ করি হস্তমুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি।
এখনো কুমার সেই বনমাঝে
পাগল হইয়া ভ্রমে
মালতীবালার চির মূৰ্চ্ছা আর
ভাঙ্গিলনা,[৩] এ জনমে—

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৭০; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৫৩-৫৪ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ গৃহে ২ বিঁধাইল ৩ ঘুচিলনা

[লীলা। গাথা]

পাণ্ডু. পৃ. ৬৬/৩৪খ

সাধিনু কাঁদিনু কতনা করিনু
ধন মান যশ সকলি ধরিনু
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেমনা মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার ?
না যদি পেলেম নাইবা পাইনু—
চাইনা ২[1] তারে
কি ছার সে বালা—তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষ-হৃদি
তাহোলে পাষাণ[2] ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে—
এ কুমতি কেন হোয়েছিল বিধি
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু[3] হৃদি—
এ নয়ন জল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ তলে ?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু—মজিয়া
তাহার কুহক-বলে ?
এত আঁখি জল—হইল বিফল ?—
বালিকা হৃদয় করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা
তার গলে দিবে পরিণয় মালা ?
এ কি লাজ নিদারুণ ?
হেন অপমান নারিব সহিতে
ঈর্ষ্যার আগুন[4] নারিব বহিতে—

'লীলা (গাথা)' শিরোনামে ভারতী পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত। বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৫ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১) পৃ. ৬০-৬১ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭-৬৮

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ চাইয়া : ভারতী ; চাই না : শৈশবসঙ্গীত
২ তা হলে পাষাণো
৩ গিয়াছিনু : ভারতী
৪ অনল

পাণ্ডু. পৃ. ৬৬/৩৪খ

ঈর্ষ্যা ? কারে ঈর্ষ্যা ? হীন রণধীরে—
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হোল[১] কিরে ?
ঈর্ষ্যা-যোগ্য সেকি[২] মোর ?
তবে শুন আজি শ্মশান-কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর !
আজ হোতে মোর রণধীর অরি—
শত নৃকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান
এ বিবাহ কভু দিব না ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ !
তবে নমি তোমা শ্মশান কালিকা
শোণিত-লুলিতা-কপাল মালিকা—
কর এই বর দান
তাহারি শোণিতে মিটায় গো তৃষা[৩]
যেন মোর এ কৃপাণ !"
কহিতে কহিতে—বিজন নিশীথে
শুনিল বিজয়—সুদূর হইতে
শত শত অট্ট হাসি
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান-শান্তিরে নাশি
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া—
কি জানি কিসের লাগি
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে—
কাঁদিয়া[৪] উঠিল জাগি !
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া—
আবার যাইল মিশি—

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৫-২৮৬ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬১-৬৩ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী ,অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮-৬৯

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হল
২ সেও কি : ভারতী
৩ মিটায় পিপাসা . শৈশবসঙ্গীত
৪ চমকি

পাণ্ডু. পৃ. ৬৬/৩৪খ

সহসা থামিল অট্টহাসি ধ্বনি
শিবার রোদন থামিল অমনি
আবার ভীষণ—সুগভীরতর
নীরব হইল নিশি—
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর—
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ
হৃদয়ে[১] জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খরধার।

—॥—

গিরি অধিপতি রণধীর সাথে[২]
লীলার বিবাহ হবে[৩]
হরষে রয়েছে আমোদে মাতিয়া[৪]
গিরিবাসী গণ সবে।[৫]
অস্ত[৬] গেল রবি— পশ্চিম শিখরে—
আইল গোধূলী কাল—
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
ক্রমশঃ[৭] আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি-ভবন পানে
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে—

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৬; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৩-৬৪ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭০

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হৃদয় : শৈশবসঙ্গীত
২ গৃহে : ঐ
৩ লীলা আসিতেছে আজি : ঐ
৪ গিরিবাসীগণ হরষে মেতেছে : ঐ
৫ বাজানা উঠেছে বাজি : ঐ
৬* অস্তে
৭ সঘন : শৈশবসঙ্গীত

পাণ্ডু. পৃ. ৬৬/৩৪খ

জ্বলিছে আলোক— বাজিছে বাজনা
ধ্বনিতেছে দশ দিশি—
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবীড়[১]
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়
বনমাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।
অনুচর গণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত
সে হরষ ধ্বনি— জন কোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।

পাণ্ডু. পৃ. ৩৩/১৮ক

[থামিল শিবিকা অনুচ]রগণ[২]
[সহসা সভয় গ]ণি[৩]
[সহসা] সকলে উ[ঠিল চী]ৎকারি[৪]
দস্যু দস্যু করি ধ্বনি![৫]
শত বীর হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি—
শত ২[৬] শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি!
আঁধার ক্রমশঃ নিবীড়[৭] হইল
বাধিল বিষম রণ

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৬ ৮৭; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৩-৬৪ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৪৭১

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ নিবিড়

২ থামিল শিবিকা পথের মাঝারে: শৈশবসঙ্গীত। বন্ধনীবদ্ধ অংশ ভারতীতে মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

৩ থামে অনুচর দল: ঐ। বন্ধনীবদ্ধ অংশ ভারতীর পাঠ থেকে গৃহীত।

৪ বন্ধনীবদ্ধ অংশ সংকলয়িতার অনুমিত; মুদ্রিত পাঠ পরিবর্তিত: 'সহসা সকলে "দস্যু দস্যু" বলি': ভারতী; 'সহসা সভয়ে "দস্যু দস্যু" বলি': শৈশবসঙ্গীত

৫ করি কোলাহল ধ্বনি: ভারতী; উঠিলরে কোলাহল: শৈশবসঙ্গীত

৬ শত

৭ নিবিড়

পাণ্ডু. পৃ. ৩৩/১৮ক

লীলার শিবিকা— কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ !

* * * * *

কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখি জল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল !
"হে মা ভগবতী— শুন এ মিনতি
রাখ গো মিনতি মোর[১]
দুখিনীর আর কেহ নাই মা গো[২]
তার' এ বিপদে ঘোর !‍[৩]
যদি সতী হই, মনে ২ যদি[৪]
তাঁহারি চরণ সেবি—[৫]
পতি বোলে যাঁরে কোরেছি বরণ
বাঁচাও তাঁহারে দেবি ![৬]
মোর তরে দেবি[৭] এ শোণিত পাত !
আমি মা—অবোধ বালা
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
ঘুচিত সকল জ্বালা !
মোর তরে তিনি হারাবেন প্রাণ ?[৮]
না— না মা রাখ এ কথা[৯]
ছেলেবেলা হোতে অনেক সহেছি[১০]
আর মা দিওনা ব্যথা !" [১১]

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৭ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৫ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭১

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ রাখ এ মিনতি মোর : ভারতী
বিপদে ডাকিব কারে : শৈশবসঙ্গীত
২-৫ ভারতীতে আছে। শৈশবসঙ্গীতে বর্জিত হয়েছে।
৬ বাঁচাও বাঁচাও তাঁরে : শৈশবসঙ্গীত
৭ কেন : শৈশবসঙ্গীত
৮-১১ ভারতীতে আছে। শৈশবসঙ্গীতে বর্জিত হয়েছে।

পাণ্ডু পৃ. ৩৩/১৮ক

কহিতে ২[১] উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি
জয় ২[২] রব— আহতের স্বর
কৃপাণের ঝনঝনি!
[সাঁ]জের জলদে ডুবে গেল রবি
আকাশে উঠিল তারা
[এ]কেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হোতেছে[৩] সারা!
[স]হসা খুলিল কারাগার দ্বার
বালিকা সভয় অতি!
নিদারুণ হাসি হাসিতে ২[৪]
পশিল বিজয়[৫] তথি!
অসি হোতে[৬] [ঝরে শোণিতের ফোঁটা]
শোণিতে মাখানো বাস
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
স্ফুরে[৭] নিদারুণ হাস!
অবাক[৮] বালিকা, বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে—
সমর বারতা শুনেছ কুমারী?
সে কথা শুনিবে তবে?"

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৭; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৫-৬৬; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৭২

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কহিতে

২ জয়

৩ হতেছে : শৈশবসঙ্গীত

৪ নিদারুণ হাসি হাসিতে হাসিতে : ভারতী
কঠোর কটাক্ষ হানিতে হানিতে : শৈশবসঙ্গীত

৫ বিজয় পশিল

৬ হতে : শৈশবসঙ্গীত

৭ ফুটে : ঐ

৮ অবাক্

পাণ্ডু. পৃ. ৩৩/১৮ক

“বুঝেছি—বুঝেছি—জেনেছি ২[১]
বলিতে হবে না আর—
না না—বল—বল—শুনিব সকলি
যাহা আছে বলিবার !
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়
বল কি বলিতে আছে !
যত ভয়ানক হোক্ না সে কথা
লুকায়ো না মোর কাছে।”
“শুন তবে বলি” কহিল বিজয়
তুলি অসি খরধার
“এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার !”
“পামর—নিদয়—পাষাণ—পিশাচ”
মূরছি পড়িল লীলা
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়—
কারা হোতে বাহিরিলা।
সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশ[২]
নিশা হোল সুগভীর
বিজয়ের সেনা পলাইল রণে
জয়ী হল রণধীর !
*   *   *   *   *
কারাগার মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—
“লীলা—রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে !”
ভূমিতল হোতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি !

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৭-৮৮ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৬-৬৮ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৩

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ জেনেছি

২ ক্রমশঃ

পাণ্ডু. পৃ. ৩৩/১৮ক

হরষ আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি!
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বোস[১] একবার হেথা—
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহ ভরে—
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের পরে।"

পাণ্ডু. পৃ. ৩৪/১৮খ

[লীলার হৃদয়ে ছুরিকা] বিঁধানো
বহিছে শোণিত ধারা
রহে রণধীর পলকবিহীন
যেন পাগলের পারা!
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা
"পূরিল না কোন আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা—
পারিনু না[২] সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা!—
হারে হা পামর কি করিলি তুই
নিদারুণ প্রতারণা—
এত দিনকার—সুখ সাধ মোর
পূরিল না— পূরিল না!"

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৮; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৮-৬৯ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩ ৭৪

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বস: শৈশবসঙ্গীত

২ পারিল না: ভারতী। শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির অনুরূপ পাঠ 'পারিনু না' দেখে মনে হয় ভারতীর পাঠ মুদ্রণপ্রমাদ।

পাণ্ডু. পৃ. ৩৪/১৮খ

এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি
রণধীর মুখে রহিল চাহিয়া
মেলিয়া অবাক আঁখি ![১]
রণধীর ক্রমে[২] শুনিল সকল—
বিজয়ের প্রতারণা—
বীরের নয়নে উঠিল জ্বলিয়া[৩]
রোষের অনল-কণা !
"পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে
বাঁচিয়া রহিব তাই !"
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি
কারাগার হোতে রণধীর তবে[৪]
বাহিরে আইল ছুটি ![৫]
দেখে সেই বিজয়ের মৃতদেহ[৬]
পড়িয়া রোয়েছে সমর ভূমে[৭]
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ-ঘুমে ![৮]

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৮ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৬৯-৭০ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মেলি অনিমেষ আঁখি : শৈশবসঙ্গীত
২ যবে : ঐ
৩ জ্বলিয়া উঠিল : ঐ
৪ শোকে রোষানলে জ্বলি রণধীর : ঐ
৫ রণভূমে এল ছুটি : ঐ
৬ দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
৭ রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে
৮* শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে গাথাটি এখানেই সমাপ্ত ; কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এর পরও ৪ ছত্র আছে এবং ভারতীর মুদ্রিত পাঠে আরও ৪ ছত্র। দ্র. পরবর্তী পৃষ্ঠায় টীকা ২

পাণ্ডু. পৃ. ৩৪/১৮খ

শত ভাগে তার কাটিয়া শরীর
দলি তারে পদতলে
পাগলের মত পড়িল ঝাঁপায়ে[১]
বিপাশা নদীর জলে ![২]

[অপ্সরা-প্রেম। গাথা]

পাণ্ডু. পৃ. ৬৭/৩৫ক

আসে সন্ধ্যা হোয়ে[৩] আঁধার আলয়ে— একেলা রোয়েছি বোসি—[৪]
শ্রম হোতে সবে আসিয়াছে ফিরে[৫]— জ্বলিল প্রদীপ কুটীরে ২[৬]
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে— নীরব[৭] প্রান্তরে চেয়ে আছি হারে
আকাশে উঠিছে শশি।
কত দিন আর রহিব এমন— মরণ হইলে বাঁচি যে[৮] এখন—

এই পৃষ্ঠায় প্রথম চার ছত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'লীলা(গাথা)'র শেষাংশ।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

উদ্ধৃতাংশ 'অপ্সরা-প্রেম। গাথা' শিরোনামে প্রথম ভারতীতে প্রকাশিত দশটি স্তবকের মধ্যে নবম স্তবক। প্রথম প্রকাশস্থলে রচয়িতার নামের উল্লেখ নেই। মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৪ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৭৬-৭৭ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮-৭৯

পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ছত্রের শেষে ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে পাশে দ্বিতীয় ছত্র লিখিত; মুদ্রিত পাঠে ছত্রগুলি পর পর বিন্যস্ত।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর :

১ পড়ে রণবীর : ভারতী

২ পাণ্ডুলিপির পাঠ এখানেই সমাপ্ত। ভারতীর মুদ্রিত পাঠে এই ছত্রের পর পাওয়া যায় আরও চার ছত্র :

তটিনী-সলিল উছসি উঠিল
ডুবি গেল রণধীর,
মরণের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
আহত-হৃদয়-বীর !

৩ হয়ে

৪ রয়েছি বসি

৫ যে যাহার ঘরে আসিতেছে ফিরে : শৈশবসঙ্গীত

৬ জ্বলিছে প্রদীপ কুটীরে কুটীরে : ঐ

৭ আঁধার : ঐ

৮ বাঁচি-রে

পাণ্ডু. পৃ. ৬৭/৩৫ক

অবশ হৃদয় দেহ দুরবল— শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল
যেতেছে দিবস নিশি—[১]
কোথা গো[২]

—॥—

[অপ্সরার উক্তি]

অদিতি ভবন হইতে যখন— আসিতেছিলাম অলকাপুরে—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন— শরৎ[৩] -তটিনী বহিছে দূরে—
সাঁজের[৪] কনক বরণ সাগর— অলসভাবে সে ঘুমায়ে আছে
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ— গৌরীশেখর[৫] গিরির কাছে—
দেখিনু সহসা বীর একজন— সমর সাগরে গিরির মতন
পদতলে আসি আঘাতে লহরী— তবুও অটল পারা
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই— শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই
উরস বরমে বরষার মত— ঠেকিছে[৬] বাণের ধারা !

এই পৃষ্ঠার প্রথম তিন ছত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'অপ্সরা প্রেম(গাথা)'র শেষাংশ।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন; ভারতী পত্রিকায় 'অপ্সরা প্রেম। (অপ্সরার উক্তি)' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৫ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৭৭-৭৮ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ পাণ্ডুলিপিতে এই ছত্রের শেষে বিরামচিহ্ন দেওয়া নেই ; কিন্তু মুদ্রিত পাঠে নবম স্তবকটি এখানেই সম্পূর্ণ। এর পরে দশম স্তবক আরম্ভ হয়েছে নিম্নলিখিত ছত্রটি দিয়ে—

কোথায় গো সখা কোথা গো !

২ পাণ্ডুলিপির এই বাক্যাংশ মুদ্রিত পাঠে বিভিন্ন স্তবকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে (এ থেকে মনে হয় যে পাণ্ডুলিপির পাঠ অসমাপ্ত)। যথা :

কোথায় গো সখা কোথাগো !
কত দিন ধোরে সখা তব আশে,
একেলা বসিয়া বাতায়ন পাশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
কোথা গো সখা কোথা গো !

৩ শারদ ৪ সাঁঝের ৫ গউরী-শিখর ৬ বরিষে

পাণ্ডু. পৃ. ৬৭/৩৫ক

অশণি বরষী[১] ঝটিকার মেঘে— দেখেছি ত্রিদশ পতি—
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙ্গিছে— তিনি সে মহান্ অতি—
এমন উদার শান্ত মুখভাব[২]— দেখেনি[৩] তাঁহারো কভু
পৃথিবী বিনত[৪] যাঁহার অসিতে— স্বরগ যেজন[৫] পারেন শাসিতে
দুরবল এই নারী-হৃদয়ের করিনু তাঁহারে[৬] প্রভু—
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া মাথার উপরে তাঁর
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি—নাশিতে বাণের ধার—
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে—দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিতে[৭], লাগিল[৮] হৃদয় মোর—
থামিল সমর-জয়ী বীর মোর—উঠিলা তরণী পরে—
বহিল মৃদুল পবন -তরণী—চলিল গরব ভরে—
গেল কতদিন, পূরব গগনে—উঠিল জলদ-রেখা—
মৃদুল ঝলকি ক্ষীণ সুদামিনী[৯]—দূর হোতে দিল দেখা
ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ অশণি সরোষে জ্বলি—
মাথার উপর দিয়া তরণীর, অভিশাপ গেল বলি ![১০]
নাবিকেরা সবে[১১] বিধাতারে তবে—ডাকিল কাতর স্বরে—
তরণী হইতে কোলাহলধ্বনি—উঠিল আকাশ পরে—
একটি লহরী উঠেনি সাগরে—একটু বহেনি বায়—
তড়িত-চরণে অশণি কেবল—দিশে দিশে দিশে ধায়[১২]—

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৫-১৬ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৭৮-৮০ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৮১

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ অশণি-ধ্বনিত : পাণ্ডুলিপিতে অন্যত্রও 'অশণি' ।
২ ভাব বুঝি : শৈশবসঙ্গীত
৩ দেখি নি
৪ পৃথ্বী নত হয়
৫ যে জনে : ভারতী
৬ তাঁহারে করিনু : শৈশবসঙ্গীত
৭ উঠিল : ঐ
৮ আকুল : ঐ
৯ মৃদু ঝলকিয়া অবশ দামিনী : ভারতী
মৃদু ঝলকিয়া ক্ষীণ সৌদামিনী : শৈশবসঙ্গীত
১০ এই ছত্রের পরবর্তী 'নাবিকেরা সবে···দিশে দিশে দিশে ধায়' অংশ ভারতীতে আছে ; কিন্তু শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।
১১ এবে : ভারতী
১২ দিক হোতে দিকে ধায় : ভারতী

পাণ্ডু. পৃ. ৬৮/৩৫খ

সহসা ভ্রূকুটী উঠিল সাগর—পবন উঠিল জাগি
শতেক উরমি নাচিয়া[১] উঠিল সহসা কিসের লাগি।[২]
সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা কহিয়া অস্ফুট[৩] বাণী
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল লইয়া তরণী খানি
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর—অধীর হইল হেন
প্রলয় কালের[৪] মহেশের মত নাচিতে লাগিল যেন।
তরণীর পরে একেলা অটল—দাঁড়ায়ে বীর আমার
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত বাজিছে হৃদয় তাঁর
দেখিতে ২[৫] ডুবিল তরণী—ডুবিল নাবিক যত[৬]—
যুঝি ২[৭] বীর সাগরের সাথে—হইলেন জ্ঞান হত।[৮]
আকাশ হইতে নামিনু তখন[৯]—ছুঁইনু সাগর জল[১০]
উরমিরা আসি খেলিতে লাগিল[১১]—চুমিয়া চরণ তল![১২]
কেশ-পাশ লোয়ে খেলিল পবন[১৩]—বারণ নাহিক মানে[১৪]
ধীরে ২ তবে গাহিতে লাগিনু[১৫]—পাগল-সাগর কানে।[১৬]

—॥—

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৬; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৮০-৮১; অথবা রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮১

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মাতিয়া
২ এই ছত্রের পরবর্তী দুই ছত্র (মুদ্রিতপাঠে চার ছত্র) ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে গৃহীত হয় নি।
৩ অফুট : ভারতী
৪ ভাঙ্গে-বিভোলা
৫ দেখিতে
৬ যারা : ভারতী
৭ যুঝি
৮ হইল চেতন হারা : ভারতী ; হইল চেতন হত : শৈশবসঙ্গীত
৯ নামিয়া, ছুঁইনু
১০ অধীর জলধি জল
১১ পদতলে আসি করিতে লাগিল
১২ উরমিরা কোলাহল
১৩ অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
১৪ কেশপাশ চারিধার
১৫ সাগরের কানে ঢালিতে তখন ; ভারতী ; সাগরের কানে ঢালিতে লাগিনু : শৈশবসঙ্গীত
১৬ লাগিনু গীতের ধার : ভারতী ; সুধীরে গীতের ধার : শৈশবসঙ্গীত
বিরতি চিহ্নের পর একই পৃষ্ঠায় রয়েছে 'কেন গো সাগর এমন চপল……' ইত্যাদি রচনাটি।

[গীত]

পাণ্ডু. পৃ. ৬৮/৩৫খ কেন গো সাগর, এমন চপল—এমন অধীর প্রাণ
শুনগো আমার গান[১]—তবে—শুনগো আমার গান !
পূরণিমা নিশি আসিবে যখন—আসিবে যখন ফিরে—
(তার)—মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো—সরায়ে[২] দিব গো ধীরে—
প্রতি[৩] হাসি তার পড়িবে তোমার বিশাল হৃদয় পরে—
(সুখে) কতনা[৪] উরমি জাগিবে তখন—জাগিবে প্রণয় ভরে[৫]—
তবে থামগো সাগর থামগো—কেন হোয়েছ[৬] অধীর প্রাণ
প্রতি উরমিরে করিব তোমার[৭]—তারার খেলেনা দান ![৮]
দিকবালাদের বলিয়া দিব—আঁকিবে তাহারা বসি—[৯]
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়—একটি একটি শশি ![১০]
(আমি) তটিনী-বালারে দিব গো শিখায়ে[১১]—না হবে তাহার আন—[১২]
(তারা) গাইবে[১৩] প্রেমের গান

তারা কানন হইতে আনি ফুলরাশি[১৪] করিবে[১৫] তোমারে দান
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেমধারা করাবে তোমারে পান—

বন্ধনী বদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

উদ্ধৃত গীতটি পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন, ভারতী পত্রিকায় প্রথম "গীত" শিরোনামে প্রকাশিত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৭ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৮১-৮২ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮২

পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ছত্রের শেষে ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে পাশেই দ্বিতীয় ছত্র লিখিত। মুদ্রিত পাঠে ছত্রগুলি পর পর বিন্যস্ত।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ তবে শুনগো আমার গান : ভারতী
২ খুলিয়ে
৩ যত : শৈশবসঙ্গীত
৪ কত আনন্দে
৫ নাচিবে পুলক ভরে
৬ হয়েছ : শৈশবসঙ্গীত
৭ দেখ তটিনী সবাই পরমাদ গনি : ভারতী ; আমি লহরী-শিশুরে করিব তোমার : শৈশবসঙ্গীত
৮ মাগিছে অভয়দান : ভারতী
৯-১২ এই তিন ছত্র ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।
১১ তটিনীরে আমি দিব গো শিখায়ে : শৈশবসঙ্গীত
১৩ গাহিবে
১৪ ……এনেছে কুসুম : ভারতী ;……আনিবে কুসুম : শৈশবসঙ্গীত
১৫ করিতে : ভারতী

পাণ্ডু. পৃ. ৬৮/৩৫খ

তবে থামগো সাগর থামগো — কেন হোয়েছ[১], অধীর প্রাণ
যদি উরমি[২] শিশুরা নীরব নিশীথে — ঘুমাতে নাহিক চায়—
তবে জানিও সাগর, বোলে দিব আমি — আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা — ফুলের সুরভি পান
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে — ঘুম পাড়াবার গান
দেখিতে ২[৩] ঘুমায়ে পড়িবে — তোমার বিশাল বুকে—
প্রতি উরমিরা[৪] দেখিবে তখন — চাঁদের স্বপন সুখে[৫]

পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'গীত'এর শেষাংশ।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৭, শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৮২-৮৩, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হয়েছ : শৈশবসঙ্গীত

২ ...উরমি

৩ অমনি তাহারা

৪ ঘুমায়ে ঘুমায়ে : শৈশবসঙ্গীত

৫ এই ছত্রের পরবর্তী অংশ পাণ্ডুলিপিতে নেই, তাছাড়া এখানেই যে গীতটি সমাপ্ত হয়েছে তার নির্দেশক কোনো বিরাম চিহ্ন বা সমাপ্তি ঘোষণাও নেই। অথচ ভারতীর মুদ্রিতপাঠে আরও ৪৯টি ছত্রের পর গীতটি সমাপ্ত হয়েছে দেখা যায়। অনুমান হয়, পাণ্ডুলিপির যে-পৃষ্ঠায় বাকি অংশ লেখা ছিল, সে-পৃষ্ঠাটি এখানে নেই, অথবা পাণ্ডুলিপিতে কবি তখন এ পর্যন্তই লিখেছিলেন; ভারতীতে প্রকাশার্থ দেবার সময় নূতন করে বাকি অংশ লিখে দিয়েছেন।

ভারতীতে প্রকাশের ছয় বছর পরে এই গীতটি কিছু কিছু পরিবর্তন সহ শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। সে-অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সর্বশেষ ছত্রের পরে উক্ত গ্রন্থে আলোচ্য গীতটিতে আরও ১২০টি ছত্র অতিরিক্ত মুদ্রিত হয়েছে; অর্থাৎ ভারতীতে প্রকাশিত পাঠের চেয়ে শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থের পাঠে ৭৬টি ছত্র বেশি। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ভারতীতে প্রকাশের পরেও সম্ভবতঃ কবি এই গীতটিতে নূতনভাবে যোগ-বিয়োগ করেছেন; সেই অতিরিক্ত অংশের পাণ্ডুলিপির কোনো সন্ধান আমাদের জানা নেই।

[ফুলবালা। গান]

পাণ্ডু. পৃ. ২৪/১৩খ

দেখে যা ২ ২[১] লো তোরা সাধের কাননে মোর—
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে হরষে ছুটিয়া[২] রে—
(সেথা)[৩] জ্যোছনা ফুটে
তটিনী লুটে[৪]
প্রমোদে কানন ভোর !
এস এস সখা এস গো[৫] হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলিরে
(সুখে) গাঁথিব মালা
গণিব তারা
করিব রজনী ভোর !
এ কাননে[৬] বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ —
খেলিব দুজনে মনের[৭] খেলা রে
(মোদের) রহিবে প্রাণে[৮]
দিবস নিশি
আধ আধ[৯] ঘুম ঘোর ![১০]

—॥—

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন। ফুলবালা (গাথা)র অন্তর্গত হয়ে 'গান' শিরোনামে প্রথম ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত। মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৫ কার্তিক, পৃ. ৩০৬, শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ৩২-৩৩, রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ২, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৪৯-৫০

'রবিচ্ছায়া'তে মুদ্রিত পাঠের শীর্ষে গানের রাগিনী উল্লিখিত হয়েছে 'কালাংড়া-খেমটা'।

টীকা. পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ দেখে যা-দেখে যা
২ ……সুরভি লুটিয়া
৩ হেথা : শৈশবসঙ্গীত, রবিচ্ছায়া
৪ …ছুটে
৫ আয় আয় সখি আয়লো
৬ একাসনে : রবিচ্ছায়া
৭ ……মনেরি
৮ প্রাণে রহিবে মিশি
৯ আধো আধো
১০ এই গানটির শেষে সমাপ্তি চিহ্নের পর পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার নীচের অর্ধাংশে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর একটি গান 'গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম' ইত্যাদি লিখিত আছে।

পাণ্ডু. পৃ. ১০/৩৬খ

[ভগ্নতরী (গাথা)
গান]

ওই কথা বল সখা[১] বল আর বার
ভাল বাসো[২] মোরে তাহা বল বার বার।
কতবার শুনিয়াছি—তবু গো[৩] আবার যাচি
ভাল বাসো[৪] মোরে তাহা বল গো আবার!

—॥—

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন। ভারতীতে প্রকাশিত ভগ্নতরী (গাথা) প্রথমসর্গে এবং শৈশবসঙ্গীত-গ্রন্থে গান-রূপে প্রথম প্রকাশিত। রবিচ্ছায়াতে এ গানের রাগিনীর উল্লেখ আছে 'সিন্ধুকাফি-কাওয়ালী'।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৬ আষাঢ়, পৃ. ১২৪-২৫ ; শৈশবসঙ্গীত (১২৯১), পৃ. ১১১ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ৩৫ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৫০১

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সখি : রবিচ্ছায়া

২ ভালবাস' : ভারতী, শৈশবসঙ্গীত

৩ তবুও

৪ ভালবাস : রবিচ্ছায়া

পাণ্ডুলিপির একই পৃষ্ঠায় আরও ৪টি গান আছে। আলোচ্য গানটি ক্রমানুসারে দ্বিতীয়।

প্রথম গানটি "ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর" রবিচ্ছায়ায় প্রকাশিত এবং গীতবিতানে পুনর্মুদ্রিত।

তৃতীয় গানটি "ও কথা বোলনা সখি—প্রাণে লাগে ব্যথা" কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা জানা যায়না।

চতুর্থ গানটি "কতদিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে" ভগ্নহৃদয়-প্রথমসর্গের শেষে গান-রূপে প্রকাশিত। যথাস্থানে এ সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চম গানটি "কি হবে বলগো সখি ভালবাসি অভাগারে" কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা জানা যায়না।

এই গানগুলি যে একই সময়ে প্রায় একই ভাবের ঘোরে লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাণ্ডুলিপির আরও কয়েকটি পৃষ্ঠায় এই ধরণের খুচরো গান লেখা আছে। গানগুলি আগে লিখে গিয়েছেন কবি ; পরে কখনও ভগ্নহৃদয়ে, কখনও শৈশবসঙ্গীতে, কখনও রবিচ্ছায়ায় মুদ্রিত করেছেন। যে-গানগুলি শেষপর্যন্ত প্রকাশ করেননি, সেগুলি সম্পর্কে শৈশবসঙ্গীতের ভূমিকায় কবি লিখেছেন,

"সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই।"

এ ধরণের অপ্রকাশিত গানের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

পাণ্ডু. পৃ. ৫৭/৩০ক

[কবিকাহিনী।

প্রথম সর্গ]

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরে এক[১]। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন ![২]
[এ]কাকী আপন মনে সরল শিশুটি
[তোমা]রি কমল বনে করিত গো খেলা
[মনের কত] কি গান গাইত[৩] হরষে

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে নেই অথবা ছিন্ন; মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৪; রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫,

পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাব্যের সূচনা আছে। পৃষ্ঠার আরম্ভে রয়েছে শৈশবসঙ্গীতের 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতার শেষাংশ এবং শেষে রয়েছে 'কবিকাহিনী' রচনার আরম্ভ। এই দুইয়ের মাঝখানে আছে 'উপহারগীতি' শীর্ষক একটি কবিতা; এর সর্বশেষ ছত্র 'ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার।' এই ছত্রটি পৃষ্ঠার উপরে ডানদিকের কোণে কবি আবার চার পঙ্‌ক্তিতে ভেঙে লিখেছেন। পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষাংশ ('হৃদয়ের') এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ('এই') ছিন্ন, তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ('প্রীতি') প্রথম অক্ষরের নীচের অংশটুকু খালি চোখেও দেখা যায়; চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ('উপহার') অস্পষ্ট নয়। 'উপহারগীতি' কবিতাটি ভগ্নহৃদয়-গ্রন্থের পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়।

'কবিকাহিনী' শিরোনাম এবং 'প্রথম সর্গ' ইত্যাদির উল্লেখ বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে নেই। এর রচনাকাল কবির স্বহস্তে লিখিত হয়েছে [আরম্ভে] 'বাড়িতে / ১লা / কার্ত্তিক / মঙ্গলবার [শেষে] '১২ই কার্তিক / শনিবার / ৪ দিন লিখি নাই।' শেষোক্ত তারিখের পাশেই পুনরায় পেন্সিলে লিখেছেন 'শনিবার / অগ্রহায়ণ / ১৮৭৭' [অর্থাৎ ১২৮৪ কার্তিক ১লা থেকে ১২ই (১৮৭৭ অক্টোবর ১৬-২৭); মাঝে ৪ দিন লেখা বন্ধ ছিল।] কবিকাহিনীর প্রথম প্রকাশ মাসিক ভারতীতে (১২৮৪ পৌষ)। গ্রন্থরূপে কবিকাহিনীর প্রকাশ ১২৮৫ কার্তিক ১৯ (১৮৭৮ নভেম্বর ৫) তারিখে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির হয়। আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বই ছাপাইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।" মালতীপুঁথির আটটি পৃষ্ঠায় কবিকাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের খসড়ালিপি পাওয়া গিয়েছে। রচনার পৌর্বাপর্য অনুসারে পাণ্ডুলিপিতে এই পৃষ্ঠাগুলির ক্রম ৫৭-৫৮, ৩৭-৩৮, ৩৫-৩৬, ৫৯-৬০।

পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠায় লিখিত "উপহারগীতি" শীর্ষক রচনাটির শেষ ছত্রের শেষে সমাপ্তি-নির্দেশক চিহ্নের বাঁ দিকে এবং শিরোনামহীন 'কবিকাহিনী'র শীর্ষে কবি নিজেই লিখে রেখেছেন

'Les Pöetes হইতে / অনুবাদিত'

অথচ 'ভারতী' পত্রিকায় অথবা 'কবিকাহিনী' গ্রন্থে এর কোনো উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আরও তথ্য অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কুটীরতলে।

২ এই ছত্রের পরবর্তী চার ছত্র 'একাকী আপন মনে……গাঁথিত মালিকা' পাণ্ডুলিপিতে ডানদিকের মার্জিনে লেখা।

৩ গাহিত।

(পাণ্ডু. পৃ. ৫৭/৩০ক) [বনের কত] কি ফুলে গাঁথিত মালিকা
বালক আছিল যবে, সে অল্প বয়সে
হৃদয় আছিল[১] তার সমুদ্রের মত
সে সমুদ্রে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত।
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি।
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
[সম]স্ত পৃথিবী দেবি! পারিত বেষ্টিতে
[নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু হৃদয়ে][২]

(পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ) দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত বায়ুধারা[৩]
দিবানিশি হু হু করি বেড়াত খেলিয়া।[৪]
বালকের হৃদয়ের গূঢ় তলদেশে
কত যে রতন রাশি ছিল গো লুকানো
কেহ জানিতনা কেহ পেতনা দেখিতে
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতি দেবী বালকের কানে[৫]

প্রভাত সমীর যথা নিশ্বাস ফেলিয়া[৬]
কহে কুসুমের কানে মর্ম্মের বারতা[৭]

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৪, ২৬৫; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৫,৮, ৭

পাণ্ডুলিপির ১০ এবং ২১, ২২, ২৩ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়নি।

পাণ্ডুলিপির ১১-১৮ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে ৯৪ ১০১ সংখ্যক।

" ১৯-২০ " " " ১০২-১০৩ " ।

" ২৪ ২৮ " " মুদ্রিত পাঠে ৫২-৫৬ সংখ্যক।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হইল

২ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন এই ছত্রের উপর দিকের সামান্য অংশ মাত্র দেখা যায়।

৩ সমীরণ

৪ হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া

৫ তার কানে কানে

৬ প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি

৭ মরম-বারতা

(পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ)

নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিতনা
কুসুমের মরমের সুরভি শ্বাসের
তুমিই কল্পনা তারে দিতে ব্যাখ্যা করি।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাহিত[১] যেমন
এমন কাহারো কাছে গাহিত[২] না আর।
তাহার নিকট দিয়া যেমন বহিত[৩]
এমন কাহারো কাছে বহিতনা বায়ু।[৪]
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়
উষার জলদময় স্বর্ণ অঞ্চল[৫]
দূর দিগন্তের প্রান্তে পড়েছে খসিয়া[৬]।
যখনি নিশীথে চাঁদ সুনীল আকাশে[৭]
সুপ্ত বালকের মত ঘুমায়ে ঘুমায়ে[৮]
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে,

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৫, ২৬৪, ২৬৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৭, ৬, ৭
পাণ্ডুলিপির ৩১-৩২ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায় না।

" ২৯-৩৬ " " " " ৫৭-৬২ সংখ্যক
" ৩৭-৪৬ " " " " ২৬-৩৫ "
" ৪৭-৪৯ " " " " ৬৩-৬৫ "

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ গাইত
২ গাইত
৩ তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
৪ আর
৫ স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
৬ উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া
৭ যখনি রজনী-মুখ উজলিত শশী
৮ সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা

পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ

ছুটিয়া[১] তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জ্যোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশতল[২] ; নিম্নে স্রোতস্বিনী,
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে।
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকেতে সবি[৩] অনাবৃত
সকলি রয়েছে খোলা চক্ষের সামনে[৪]
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত!
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু [কবি] নিশাদেবী কি মোহন মন্ত্র
[পড়ি দেয়] সমুদয় জগতের পরে
[সকলি দেখায়] যেন রহস্যে পূরিত।
[সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের] মতন
ওই স্তব্ধ নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
পি[ছলি]য়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশ সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ,
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিতে[৫]
একাকী গম্ভীর কবি নিশাদেবী ধীরে

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৭-৮
পাণ্ডুলিপির ৫০-৭৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ৬৬-৯০ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বসিয়া

২ সুনীল আকাশ, হাসে

৩ দিবসের আলোকে সকলি

৪ চখের সমুখে

৫ নিদ্রিত

পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সে বালক কত কি ভাবিত[১]।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত, গহ্বর
সকলি আছিল তার[২] সাধের বসতি,
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
জগতের সর্ব্বত্রেই পাইত শুনিতে[৩]
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনক কিরণময় উষার জলদে
একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীতি[৪]
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম।
অনন্ত তারা খচিত নিশীথ গগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর গান,
তাই শুনি সে যেমন হইয়া বিহ্বল[৫]
নীরবে আকাশপানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীর তলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি
সে ধ্বনি পশিত তার বুকের[৬] ভিতর।
নিশার আঁধার কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে
তখন বালক[৭] উঠি তুষার মণ্ডিত

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৫, ২৬৬ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮-৯
পাণ্ডুলিপির ৭৫-৭৭ এবং ৭৮-৯৮ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ৯১-৯৩ এবং ১০৪-১২৪ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ...সেই কবি ভাবিত কত কি

২ সকলি কবির ছিল

৩ কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে

৪ গীত

৫ তাহাই শুনিয়া যেন বিহ্বল হৃদয়ে

৬ ... ...প্রাণের

৭ তখন সে কবি

পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ

সমুচ্চ পর্ব্বত শিরে গাইত একাকী
প্রকৃতি বন্দনা-গান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া—
কেবল পর্ব্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান,
কেবল সুদূর বনে দিগন্ত বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুনঃ[১] আসিত ফিরিয়া
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ পৌষ, পৃ. ২৬৬ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড-পৃ ৯
পাণ্ডুলিপির ৯৯-১১০ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১২৫-১৩৬ সংখ্যক।
পাণ্ডুলিপিতে কবিকাহিনীর প্রথম সর্গে প্রাপ্ত মোট ছত্র সংখ্যা এক শত তেরো। ১১৩ সংখ্যক ছত্রই পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ ছত্র। উক্ত ছত্রের শেষতম 'পল্লব' শব্দটি অস্পষ্ট; শেষ অক্ষরটি ছিন্ন। তার পরেও একটি ছত্র কবি লিখেছিলেন, কিন্তু বর্জন করেছেন। বর্জিত ছত্রটি হল :

কুন্তলে জড়িত যত কুসুমের মালা

এ-থেকে অনুমান করা যায় কবিকাহিনী প্রথম সর্গ লেখা এখানেই সমাপ্ত হয়নি ; অন্য পৃষ্ঠাতেও এর অনুবৃত্তি ছিল যার সন্ধান আমাদের জানা নেই। কারণ পাণ্ডুলিপিটি যখন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয় তখনই এর "...কতকগুলি পাতা পাওয়া যায়নি।" (—রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫)

মুদ্রিতপাঠে কবিকাহিনী প্রথম সর্গের মোট ছত্রসংখ্যা ২৩৮, পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত প্রথম সর্গের মোট ১১৩ ছত্রের মধ্যে ১০, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩২ সংখ্যক এই ৬টি ছত্র মুদ্রিতপাঠে পাওয়া যায়নি।

উপরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে কবিকাহিনীর পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত প্রথমসর্গে মোট ১১৩টি ছত্রের মধ্য থেকে ১০৭টি ছত্র মুদ্রিতপাঠে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মুদ্রিতপাঠে প্রথমসর্গে মোট ছত্র সংখ্যা ২৩৮ ; অর্থাৎ মুদ্রণকালে যে পাণ্ডুলিপি বা প্রেসকপি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আরও ১৩১টি ছত্র অতিরিক্ত ছিল।

পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত পাঠ মিলিয়ে দেখলে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে পাণ্ডুলিপির ছত্রের পৌর্বাপর্য মুদ্রিতপাঠে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। (যথা—পাণ্ডুলিপিতে যে ছত্রটি ১২-সংখ্যক, মুদ্রিত পাঠে সেটিকে দেখতে পাওয়া যায় ৯৫-সংখ্যক ছত্ররূপে, আবার পাণ্ডুলিপিতে যে-ছত্রটি ৪২-সংখ্যক মুদ্রিত পাঠে সেটির ক্রমিক সংখ্যা ৩১)

এ থেকে অনুমান হয়, কবিকাহিনীর অন্য কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল যা থেকে বর্তমান মুদ্রিতপাঠ গৃহীত। তবে এটিই যে কবিকাহিনীর প্রথম খসড়া সে সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই। সে-দিক দিয়ে এই খসড়ালিপির মূল্য অপরিসীম।

মালতীপুঁথির যে পৃষ্ঠাগুলি অথবা 'কবিকাহিনী'র যে অংশের পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়নি সে সম্বন্ধে কবিকাহিনীর প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কোনো উত্তরাধিকারী কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ পুন

পাণ্ডু. পৃ. ৫৮/৩০খ

সে গম্ভীর গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত
নীরবে তটিনী যেত সুমুখে[১] বহিয়া
নীরবে নিশীথ বায়ু কাঁপাত পল্ল[ব]

[তৃতীয় সর্গ]

পাণ্ডু. পৃ. ৩৭/২০ক

[জ্যোৎস্নায় নিম]গ্ন ধরা, নীরব রজনী
[অরণ্যের অন্ধ]কার ময় গাছগুলি
[মাথার] উপরে মাখি রজত জোছনা
শাখায় শাখায় সব[২] করি জড়াজড়ি
কেমন গম্ভীর ভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার
হোথা সরসীর বুকে[৩] প্রশান্ত জোছনা,
ছুটিয়া চলেছে হেথা শীর্ণ স্রোতস্বিনী[৪]
তরঙ্গিল[৫] বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মূরতি।
এমন[৬] নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর
শুধু দূর শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,

এই পৃষ্ঠার প্রথম তিন ছত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'কবিকাহিনী' প্রথমসর্গের শেষাংশ (মুদ্রিতপাঠে ১৩৭-১৩৯ সংখ্যক)।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

তৃতীয় সর্গের মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ ফাল্গুন, পৃ. ৩৬১ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯

পাণ্ডুলিপিতে কবিকাহিনী : দ্বিতীয় সর্গের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কারণ "মালতীপুঁথি নামে পরিচিত বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানি স্পষ্টতই একখানি বৃহৎ বাঁধানো খাতা ছিল। কিন্তু এখন সেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং খোলা পাতাগুলিও অত্যন্ত জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে। এক দিকের শক্ত রঙিন মলাটও পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়া যায়নি।"—(প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ. ৬৫৪)

পাণ্ডুলিপিতে 'কবিকাহিনী : তৃতীয় সর্গ' বলে কিছু লেখা নেই ; তবে মুদ্রিত পাঠের কবিকাহিনী তৃতীয় সর্গের অনুরূপ ৬২টি ছত্রের সন্ধান বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়েছে।

পাণ্ডুলিপির ১-৭, ৮-১০ এবং ১১-১২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ২০-২৬, ২৯-৩১ এবং ৩৩-৩৪ সংখ্যক।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সমুখে

২ ঘন

৩ হোথায় সরসীবক্ষে

৪ লীলাময়ী প্রবাহিনী চলেছে ছুটিয়া

৫ লীলাভঙ্গ

৬ কেমন

পাণ্ডু. পৃ. ৩৭/২০ক

শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সরসরি[১] যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্ত বায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কতবার আমি
গম্ভীর অরণ্যমাঝে[২] করেছি ভ্রমণ
স্নিগ্ধরাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি, নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের ভিতর বাগে[৩], এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়
জানি না সুখে কি দুখে[৪] প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো যেমন[৫] !
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভূলিয়ে[৬] যেন গিয়েছি সহসা,
বলা যেন হয় নাই[৭] প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাইনা তা' খুঁজি !
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ ফাল্গুন, পৃ. ৩৬০; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ২৯ ৩০
পাণ্ডুলিপির ১৩-৩৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে ৩৫-৫৬ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ তটিনীটি সর সর
২ গম্ভীর অরণ্যে একা
৩ প্রাণের মরমতলে,
৪ জানিনা কি এক ভাবে
৫ ······কেমন !
৬ ···ভুলিয়া
৭ বলা হয় নাই যেন

পাণ্ডু. পৃ. ৩৭/২০ক

এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে
[যে] হারা সুখের তরে দিবানিশি তার
[হৃ]দয়ের এক দিক শূন্য হোয়ে আছে !
[এম]ন নীরব রাত্রে কখনো কি [সে] গো[১]
[ফেলে না]ই মর্ম্মভেদী এক[টি নিশ্বাস ?]
কতস্থানে আজ রাত্রে নিশীথ- [প্রদীপে]
উঠিছে প্রমোদধ্বনি বিলাসীর [গৃহে]
মুহূর্ত্ত ভাবেনি তারা আজ নিশীথে[ই]
কত হৃদি পুড়িতেছে নীরব[২] অনলে
কত শত হতভাগ্য[৩] আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলা হা-হা হা[৪] করি বেড়ায় ভ্রমিয়া
জোছনায় ঘুমাইছে[৫] অরণ্য-কুটীর ;
বিষণ্ণ নলিনীবালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া

—॥—

পার কি বলিতে কেহ কি হ'ল এ বুকে
যখনি শুনি গো ধীর সঙ্গীতের ধ্বনি
যখনি দেখি গো ধীর প্রশান্ত রজনী
কত কি যে কথা আর কত কি যে ভাব

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ ফাল্গুন পৃ. ৩৬১ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০

পাণ্ডুলিপির ৩৫-৫০ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে ৫৭-৭২ সংখ্যক।

পাণ্ডুলিপির ৫১-৬২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে নেই। এই ছত্রগুলির সঙ্গে পাণ্ডুলিপির চতুর্থ সর্গের ১৫১-১৬২ সংখ্যক ছত্রগুলির ভাবের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সে কি গো কখনো
২ কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন
৩ কত শত হতভাগা
৪ একেলাই হা হা
৫ ঝোপে-ঝাপে ঢাকা ওই

পাণ্ডু. পৃ. ৩৭।২০ক

উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া আলোড়িয়া উঠে !
দূরাগত রাখালের বাঁশরীর মত
আধভোলা কালিকার স্বপ্নের মতন—
কি যে কথা কি যে ভাব ধরি ধরি করি
তবুও কেমন ধারা পারিনা ধরিতে !
কি করি পাইনা খুঁজি পাই না ভাবিয়া ;
ইচ্ছা করে ভেঙ্গে চুরে প্রাণের ভিতর
যা কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা।

[চতুর্থ সর্গ]

পাণ্ডু. পৃ. ৩৮/২০খ

[বাজাও] রাখাল তব সরল বাঁশরী
[গাও গো] মনের সাধে প্রমোদের গান,
[পাখীরা] মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত
[কানন] ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু
[উপত্য]কা ময় যবে ফুটিয়াছে ফুল
[তখন] তোদের আর কিসের ভাবনা ?
[দেখি] চিরহাস্যময় প্রকৃতির মুখ
[দি]বানিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা,
সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে
সমস্ত জগৎ যবে গাহে গো সঙ্গীত
[ত]খন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে
[ক্ষু]দ্রতম আপনার মনের বিষাদে।

এই পৃষ্ঠার প্রথম আট ছত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'কবিকাহিনী'র তৃতীয় সর্গের শেষাংশ।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

'চতুর্থ সর্গ' মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৪-৯৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮।

পাণ্ডুলিপির ১-১২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১০৯-১২০ সংখ্যক।

পাণ্ডুলিপিতে 'কবিকাহিনী-চতুর্থসর্গ' বলে কিছু লেখা নেই। পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত তৃতীয়সর্গের অংশ যেখানে শেষ হয়েছে তারই উল্টোপিঠে চতুর্থসর্গের ১০৯ থেকে ১৩৫ সংখ্যক ছত্র (মুদ্রিতপাঠ অনুসারে) পাওয়া গিয়েছে। কবি যদি তৃতীয়সর্গ শেষ করেই চতুর্থসর্গ আরম্ভ করতেন, অথবা কবিকাহিনী প্রথম লেখার সময়ে এর সর্গ-বিভাগের পরিকল্পনা তাঁর মনেও থাকত, তাহলে তৃতীয় সর্গের অংশ বিশেষের শেষে চতুর্থ সর্গের আরম্ভই পাওয়া যেত। এ থেকে অনুমান করা সহজ হয় কবিকাহিনীর মুদ্রিত পাঠে যে ৪টি প্রধান বিভাগ বা সর্গ পাওয়া যায় সে বিভাগ কবি নিশ্চয়ই অন্য কোনো দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বা মুদ্রণের জন্য প্রদত্ত প্রেসকপিতে করেছিলেন, যার সন্ধান এখনও আমাদের জানা নেই।

পাণ্ডু. পৃ. ৩৮/২০খ

[স]মস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস না বসি,
[জ]গতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ দেখি[১]
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ থাকে[২] কি গো আর !
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন,
স্তব্ধ নভস্তল ভেদি সরল রাগিনী[৩]
[একে]ক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ
[মনে] হয় আমারি তা প্রাণের রাগিণী,
[সেই] রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ :
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী !
কখনো বা মনে হয় পুরাতন কাল
[এ]ই রাগিণীর মত আছিল মধুর
এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট,
তাই শুনি ধীরে ধীরে পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে।

পাণ্ডু. পৃ. ৩৫/১৯ ক

[ভবি]ষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান
বর্ত্তমান ধীরে ধীরে মিশিছে অতীতে।[৪]
অস্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস,
দিবস নিশার ক্রোড়ে[৫] পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্রে[৬] ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে—মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ প্রথমখণ্ড, পৃ ৩৮, ৩৫-৩৬।

পাণ্ডুলিপির ১৩-১৬, ১৭, ১৮-২৬ এবং ২৭-৩২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ১২১-২৪, ১২৫-২৬, ১২৭-৩৫ এবং ৫৭-৬২ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হেরি

২ ··· ··· রহে

৩ মুদ্রিতপাঠে এই ছত্রটি রূপান্তরিত হয়েছে দুটি ছত্রে :—

বসন্তের সুরভির বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সকল রাগিণী

৪ বর্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে

৫ কোলে

৬ চক্র

পাণ্ডু. পৃ. ৩৫/১৯ক

পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ চিহ্ন[১] পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী সময় সেওগো,[২]
নূতন গড়েনি কিছু ভাঙ্গেনি পুরাণো
বাহিরের কত কি যে ভাঙ্গিল চূরিল
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই
বরষে বরষে দেহ ভাঙ্গিয়া যেতেছে
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর
নলিনীরে তেমনিই ভালবাসি তবু[৩],—
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্ত্তি ছিল এ হৃদয়ে
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙ্গিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকান[৪] সে ধন।
ভেবেছিনু একবার এই যে বিষাদ

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬। পাণ্ডুলিপির ৩৩-৫৬ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ৬৩-৮৬ সংখ্যক।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ……চিহ্ন

২ দুর্দ্দান্ত সময়-স্রোত অবিরাম গতি

৩ নলিনীরে ভালবাসি তবুও তেমনি

৪ …লুকানো

পাণ্ডু. পৃ. ৩৫/১৯ ক

নিদারূণ[১] তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চূরিবে
পারেনি ভাঙ্গিতে কিন্তু এক তিল তাহা
যেমন আছিল হৃদি[২] তেমনি রোয়েছে।
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি আছে যে বল
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী—
গাওগো বিহগ তব প্রমোদের গান
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি,
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে?
যা কিছু সুন্দর দেবি তাহাই মঙ্গল—
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবী
[সে]হন[৩] অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
[অম]ন সুন্দর আহা নলিনীর মন
[জীবন্ত] সৌন্দর্য দেবী ; তোমার এ রাজ্যে
[অনন্ত] কালের তরে হবে না বিলীন।
[যে আশা] দিয়াছ হৃদে [ফলিবে তা] দেবি
[একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়]
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতি দে[বি]
সংশয় কখনো[৪] আমি করি না স্বপনে
কি সঙ্গীত শিখায়েছ আশারে হে দেবি
সে গীতে হৃদয় মোর হোয়েছে বিলীন!

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪, চৈত্র, পৃ ৩৯৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৩৬।
পাণ্ডুলিপির ৫৭-৭৮ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ৮৭-১০৮ সংখ্যক।
পাণ্ডুলিপির ৭৯-৮০ ছত্র মুদ্রিতপাঠে পাওয়া যায় না।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ নিদারুণ
২ ···মন
৩ তিল
৪ কখন

পাণ্ডু. পৃ. ৩৫/১৯ক

পৃথিবীতে এক মন থাকে দুই হোয়ে
শরীরের ব্যবধানে, স্বর্গে গিয়া তারা
একত্রে মিলিয়া যায় জেনেছি নিশ্চয়।"
ক্রমে কবি যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া[১]
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোল[২] উপনীত।
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে—
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্।
নেত্র তার বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি—
যেন তার নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি—
দৃষ্টির সম্মুখে তার দিগন্তও যেন
খুলিয়া দিত গো তার[৩] অভেদ্য দুয়ার!
যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্র লোকে কোরেছে স্থাপিত
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন
কহিত কাতর স্বরে নয়ন ঢাকিয়া[৪]—
"একিরে অনন্ত কাণ্ড মরি যে তরাসে[৫]—
কোথা ওগো সুরবালা, অনন্ত জগতে
আনিয়া কি খেলা খেল লয়ে ক্ষুদ্র মন

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯
পাণ্ডুলিপির ৮১-৮৩ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে পাওয়া যায় না।
,, ৮৪-১০০ ,, ,, ,, ১৩৬-১৫২ সংখ্যক।
,, ১০১-১০২ ,, ,, ,, পাওয়া যায় না।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ......ছাড়াইয়া সীমা
২ ...হোলো...
৩ ...নিজ...
৪ ...ঢাকিয়া নয়ন
৫ ...পারিনা সহিতে

পাণ্ডু. পৃ. ৩৫/১২ক

জ্ঞান হোল অবসন্ন, পরান অবশ
কোথায় ঢাকিব দেবি এ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি
কোথায় লুকাব দেখি এ সঙ্কীর্ণ মন।"

* * * * * * * *

সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া
কি গান গাইছে কবি শুনগো কল্পনা[1] !
"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয় !
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে—
একটি সন্ধ্যার তারা ! সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষার শুভ্র মস্তক তোমার।
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাঁহার পরে ; সে ঘোর অটবী[2]
ঘিরিয়া হু হু হু করি তীব্র গাঢ় বায়ু[3]
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস।
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া গেল[4] উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে।
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোলো।
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব।
[সাড়া শব্দ নাই মুখে, অতি ধীরে ধীরে]

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯১ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৩৯

পাণ্ডুলিপির ১০৩-১০৫ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে পাওয়া যায় না।

পাণ্ডুলিপির ১০৬-১২৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১৫৩-১৭১ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ শুন কলপনা

২ অরণ্য

৩ ঘেরিয়া হু হু হু করি তীব্র শীত বায়ু

৪ ···এল

পাণ্ডু. পৃ. ৩৬/১৯খ

[অ]তি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
[সু]গম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া।
কি মহান্! কি নীরব![1] কি গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি, ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব ওগো হিমালয়
[নী]রব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার,
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্যমনে সভয়ে বিস্ময়ে!
···রব নগর গ্রাম নিস্পন্দ কানন![2]
[আমি]ও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া
[আঁধা]র মহাসমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে
ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র নর আমি শৈলরাজ!
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে[3] হোয়ে হতজ্ঞান প্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া!
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা
অনিমিখ নত[4] নেত্র মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া!

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪, চৈত্র, পৃ. ৩৯৫-৯৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০

পাণ্ডুলিপির ১২৫-১৩৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১৭২-১৮১ সংখ্যক
" ১৩৫ " " " পাওয়া যায় না
" ১৩৬-১৪৬ " " " ১৮২-১৯২ সংখ্যক

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কি মহান্! কি প্রশান্ত!

২ ছত্রটি মুদ্রিতপাঠে নেই

৩ বিস্ময়ে

৪ অনিমিষ নেত্রগুলি···

পাণ্ডু. পৃ. ৩৬/১৯খ

অযুত তারকা কুল! শুনগো তোমরা
একদৃষ্টে চাহিও না এমন করিয়া
আমার মুখের পানে লক্ষ নেত্র মেলি!
অন্ধকার ভেদি ওই দৃষ্টি তোমাদের
দেখিলে হৃদয় যায় সঙ্কুচিত হোয়ে
মরমের মর্ম্মস্থল উঠে গো কাঁপিয়া!
ওদিকে সুদূর শৈলে ঝরিছে নির্ঝর
মৃদু ঝর ঝর ধ্বনি পশিছে মরমে,
হে নির্ঝর! ও কি গান গাইতেছ তুমি?
ও গান গেও না আমি করি গো বারণ!
একাকী গভীরতম নীরব নিশীথে
যখনি শুনি গো ওই মৃদু ঝর ঝর;
হু হু করে উঠে প্রাণ মর্ম্মের মর্ম্মেতে
আকুলিয়া উঠে যেন কি যেন কি ভাব;
বুকের ভিতরকার কথাগুলি যেন
বাহির হইয়া পড়ে শুনিলে সে ধ্বনি!
ওগো হিমালয়! তুমি কি গম্ভীরভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল!
… …ঝটিকা ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ অশনি
… …বুকের পরে কোরেছে আঘাত,
… …গিয়াছে পোড়ে প্রচণ্ড প্রস্তর
… …ড়ছে কত তুষারের স্তূপ।
… …যেন মহর্ষির মত
… … …

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ ৩৯৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০

পাণ্ডুলিপির ১৪৭-১৬২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে পাওয়া যায় না। ১৪৭-১৫০ সংখ্যক চার ছত্রের সঙ্গে পূর্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিতপাঠের ১৮৯-১৯২ সংখ্যক চারিটি ছত্রের তুলনা করলে মনে হয় পুনরুক্তি হবে ভেবেই কবি এই ছত্রগুলি মুদ্রণকালে বর্জন করেছেন।

পাণ্ডুলিপির ১৫১-১৬২ সংখ্যক ছত্রগুলির সঙ্গে পাণ্ডুলিপির তৃতীয় সর্গের ৫১-৬২ সংখ্যক ছত্রগুলির ভাবের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পাণ্ডুলিপির ১৬৩-৬৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১৯৩-৯৪ সংখ্যক।

'… …' চিহ্নিত অংশের পাণ্ডুলিপি ছিন্ন; ফলে পাণ্ডুলিপির ১৬৫-৬৯ সংখ্যক ৫টি ছত্র খণ্ডিত এবং ১৭০ সংখ্যক ছত্রটি সম্পূর্ণ লুপ্ত। এগুলিও মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়নি।

পাণ্ডু. পৃ. ৩৬/১৯খ

দেখিছ কালের লীলা করিছ গণনা—
কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া— ১৭২
সিন্ধুর বেলার চক্ষে[১] গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ কিছু লক্ষ্য না করিয়া। ১৭৪
কত কাল আইল রে গেল কতকাল
হিমাদ্রি গিরির[২] ওই চক্ষের উপরি! ১৭৬
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া ১৭৮
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে— ১৮০
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি!
মানুষ সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে ১৮২
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে—
যা দেখিছ—যা দেখেছ তাতে কি এখনো ১৮৪
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠেনি শিহরি?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্য জগতে ১৮৬
রক্তপাত—অত্যাচার—ঘোর[৩] কোলাহল—
দিতেছে মানব মনে বিষ মিশাইয়া! ১৮৮
কত কোটি কোটি লোক অন্ধ কারাগারে
অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া ১৯০
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ ১৯২
কলঙ্ক শৃঙ্খল তার অলঙ্কার রূপে
আলিঙ্গন কোরে তারে রেখেছে গলায়। ১৯৪
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশীরা ১৯৬

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪, চৈত্র, পৃ. ৩৯৬ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১
পাণ্ডুলিপির ১৭১-১৯৬ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ১৯৫-২২০ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বক্ষে : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ.

২• তোমার

৩ পাপ

পাণ্ডু. পৃ. ৩৬/১৯খ

যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তি ভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন সে অধীনেরে দলিবার তরে
অধীন সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু
সবল সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল
দুর্ব্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জ্জিতে!
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবে গো ভাঙ্গিয়া—
না—তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে—
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল
বল তার—হিমালয়[১] দেখিছ কি তাহা?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য!
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া!
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা—
[তবু] তারা সভ্য [বলি করে অহঙ্কার]

পাণ্ডু. পৃ. ৫৯/৩১ক

[ক]ত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে খুঁড়িছে![২]
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি!
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৬-৯৭; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৪১-৪২

পাণ্ডুলিপির ১৯৭-২২২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ২২১-২৪৬ সংখ্যক।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ …হিমগিরি

২ বিঁধিছে

পাণ্ডু. পৃ. ৫৯/৩১ক

উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পর অশ্রুজলে ঢালে হাসিমাখা বিষ !
পৃথিবী জানে না গিরি !—হেরিয়া পরের জ্বালা
হেরিয়া পরের মর্ম্ম দুখের উচ্ছ্বাস
পরের নয়নজলে, মিশাতে নয়ন জল
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তি ধামে ?
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা—প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভালবাসে যারা,
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহবা রতন-ময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে
অথচ সমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে ২[1] করিতেছে ভিক্ষান্ন সন্ধান !
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লয়ে[2]
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস !

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯৭ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২ ৪৩
পাণ্ডুলিপির ২২৩-৪৮ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ২৪৭-৭২ ।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ . পথে

২ ...লোয়ে

পাণ্ডু. পৃ. ৫৯/৩১ক

সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব!
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠেগো শিহরি,
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ!
এ অশান্তি কবে দেব! হবে দূরীভূত?
অত্যাচার গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী দেব! করিছে ক্রন্দন
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়।
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
কবে এ আঁধার ভার করিয়া নিক্ষেপ
[স্না]ন করি প্রভাতের শিশির সলিলে
[ত]রুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!
[অ]যুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব
[এক] গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
[নাইক দ]রিদ্র ধনী, অধিপতি প্রজা,
[কেহ কারো] কুটীরেতে করিলে গমন
[মর্য্যাদার অপ]মান করিবে না মনে।
[সকলেই সকলের] করিতেছে সেবা
[কেহ কারো প্রভু নয় ন]হে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন [ভাষা]
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস—
দ্বেষ, নিন্দা, ক্রুরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!
হিমাদ্রি! মানুষ-সৃষ্টি আরম্ভ হইতে

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৩৯১; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪।
পাণ্ডুলিপির ২৪৯-২৫৭ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ২৭৩-২৮১ সংখ্যক।
" ২৫৮ " " " পাওয়া যায়নি।
" ২৫৯-২৭৬ " " ২৮২-২৯৯ "

পাণ্ডু. পৃ. ৫৯/৩১ ক

অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি—
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
বলে তবে[১] কবে গিরি হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ !
সে দিন আসিবে গিরি। এখনই[২] যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে !
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয় !
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে।
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে—
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো—
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতি দেবি
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত, দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।"
সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত !
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করে গো[৩] উর্ব্বরা।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪, চৈত্র, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৪৪
পাণ্ডুলিপির ২৭৭-৩০০ ছত্র যথাক্রমে মুদ্রিতপাঠে ৩০০-৩২৩ সংখ্যক।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ তবে বল

২ এখনিই

৩ করয়ে

পাণ্ডু. পৃ. ৫৯/৩১ ক

উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
সমস্ত পৃথিবীময়[১] পোড়েছে ছড়ায়ে
অসীম করুণা সিন্ধু[২]। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে
[ব্যাধ শরে] নিপতিত পক্ষীর[৩] মরণে
[বাল্মীকির সা]থে যিনি করেন রোদন
[কবির প্রাচীন নেত্রে] প্রকৃতির[৪] শোভা
[এখনও কিছুমাত্র হয়] নি পুরাণো
[এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে[৫] গহ্বরে
[একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।]
[বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল] শ্মশ্রু[৬]

পাণ্ডু. পৃ. ৬০/৩১ খ

[একদিন হি]মাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
[কবি]র অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ চৈত্র; পৃ. ৩৯৮-৯৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৪৫-৪৬
পাণ্ডুলিপির ৩০১-৩১২ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে ৩২৪-৩৩৫ সংখ্যক।

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ অসীম করুণা সিন্ধু
২ সমস্ত পৃথিবীময়
৩ পাখীর
৪ পৃথিবীর
৫ শিখরে
৬ এই ছত্রের পরবর্তী পাণ্ডুলিপির অংশ সম্পূর্ণ ছিন্ন। উক্ত অংশে মোট ক'টি ছত্র লেখা ছিল তা অনুমান করা কঠিন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এ-পৃষ্ঠার শেষ প্রাপ্তি পর্যন্ত কবি লিখেছিলেন তাহলে নীচের দিকে মার্জিন অংশে আরও ৩টি ছত্র হয় তো ছিল। মুদ্রিতপাঠের সেই তিনটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মুরতি ৩৩৬ সংখ্যক ছত্র
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার ৩৩৭ " "
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাত-দেব ৩৩৮ " "

অতঃপর মুদ্রিতপাঠে ৩৩৯-৩৫৫ সংখ্যক ছত্র পর্যন্ত আরও ১৭টি ছত্র অতিরিক্ত আছে। এ-অংশ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় নি।

পাণ্ডু. পৃ. ৬০/৬১ খ

হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
[এ]কটি মানুষ সেথা ফেলেনি নিশ্বাস,
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
[হ]রিত পল্লব সেথা[১] করিত প্লাবিত
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতা কুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান ![২]
কবির অন্তিমশয্যা-শিয়রের কাছে
কানন সৃজিত হল লতা গুল্ম গাছে !
আজিও তটিনী সেথা যায় গো বহিয়া
বাতাস কত কি কথা যায় গো কহিয়া।

—০—

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী ১২৮৪ চৈত্র; পৃ ৩৯৮-৯৯ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৪৫-৪৬

পাণ্ডুলিপির ৩১৫-৩২৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিতপাঠে যথাক্রমে ৩৫৮-৩৬৭ সংখ্যক।

কবিকাহিনী চতুর্থ সর্গের মুদ্রিতপাঠে মোট ছত্র সংখ্যা ৩৬৭

" " " পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত " " ৩২৮

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ তার

২ মুদ্রিতপাঠে কবিকাহিনী চতুর্থ সর্গের এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এই ছত্রের পর আরও ৪টি ছত্র আছে (দ্র. ছত্র সংখ্যা ৩২৫-৩২৮)। মুদ্রণকালে এই ছত্র চতুষ্টয় বর্জিত হয়েছে।
চতুর্থ সর্গের শেষে পাণ্ডুলিপিতে নীচে ডান দিকে লেখা আছে '১২ই কার্ত্তিক / শনিবার / ৪ দিন লিখি নাই।'
চতুর্থ সর্গের শেষে পাণ্ডুলিপিতে নীচে বাম দিকে লেখা আছে 'শনিবার / অগ্রহায়ণ / ১৮৭৭'।

[ভগ্নহৃদয়]

পাণ্ডু. পৃ. ২৬/১৪খ (২)

তোমারেই করিয়াছি সংসারের[১] ধ্রুবতারা—
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক', পথহারা !
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল এ আঁখিপরে[২] ঢাল গো আলোক-ধারা[৩] !
ও মুখানি[৪] সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা[৫]—
কখনো[৬] কুপথে[৭] যদি—ভ্রমিতে চায়[৮] এ হৃদি—
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ![৯]

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, (১২৮৭ কার্তিক), পৃ. ৩৩৭ ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (১৮০২ শক, ফাল্গুন), পৃ. ২১১ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ১৩২ ; গীতবিতান (১৩৬৭ আশ্বিন), পৃ. ৩১৮ ।

'তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা' ইত্যাদি গান (রাগিনী-ছায়ানট) প্রথম ভারতীতে গীতিকাব্য ভগ্নহৃদয়ের 'উপহার'-রূপে কিছু কিছু পরিবর্তন সহ প্রকাশিত। অতঃপর একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে গীত (রাগিনী-আলাইয়া ঝাঁপতাল)। ঐ বছরের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আরও কিছু পরিবর্তন সহ মুদ্রিত। একই গান রবিচ্ছায়া এবং গীতবিতানেও সংকলিত। শেষোক্ত দুইস্থলে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পাঠই গৃহীত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ছত্রের প্রথমে কবি লিখেছিলেন 'তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রুবতারা', পত্রের উক্ত ছত্রে উপরে 'তুমি যদি হও মোর' স্থলে 'তোমারেই করিয়াছি', লিখেছেন ; কিন্তু এই পরিবর্তনের পর প্রথমে লেখা 'তুমি যদি হও মোর' অংশ কাটেননি। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রেও প্রথমে লিখেছিলেন, 'তাহোলে কখনো আর হবনাক' পথহারা ; পরে ছত্রের উপরে 'তাহোলে কখনো আর' স্থলে 'এ সমুদ্রে আর কভু' লিখেছেন ; কিন্তু এই পরিবর্তনের পর প্রথমে লেখা 'তাহোলে কখনো আর'-অংশ কাটেননি। তথাপি প্রথম লিখিত অংশ বর্জিত বলেই ধরা হয়েছে ; কারণ ভারতীতে এবং অন্যত্র মুদ্রিত পাঠগুলি দেখেও মনে হয় যে উল্লিখিত অংশগুলি বর্জিত। কবি শুধু বর্জন-চিহ্ন দেননি।

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১	জীবনের	: ভারতী, তত্ত্ববোধিনী
২	নয়নজলে	: তত্ত্ববোধিনী
৩	কিরণধারা	: ঐ
৪	তব মুখ	: ঐ
৫	তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা	: ঐ
৬	কখন	: ঐ
৭	বিপথে	: ভারতী, তত্ত্ববোধিনী
৮	চাহে	: তত্ত্ববোধিনী

৯ পাণ্ডুলিপিতে এবং তত্ত্ববোধিনীতে এইটিই শেষ ছত্র কিন্তু ভারতীতে মুদ্রিতপাঠে আরও দুটি ছত্র অতিরিক্ত দেখা যায়। ছত্র দুটি হল,

চরণে দিনু গো আনি—এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।

ভারতীতে 'ভগ্নহৃদয়-গীতিকাব্যে'র উপহার রূপে এই গানটি প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল ; কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়ের উপহার' পত্রে এ-গান আর দেখতে পাওয়া যায়না। ভগ্নহৃদয়-গ্রন্থে মুদ্রিত 'উপহার' স্বতন্ত্র ; পাঁচটি স্তবকে (প্রতিস্তবকে ৬ ছত্র) সম্পূর্ণ। শ্রীমতী হে-কে সম্বোধন করে লিখিত। তার আরম্ভ—

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত··· ইত্যাদি

পাণ্ডু. পৃ. ২৬/১৪খ (১)

[ক্ষ]মা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার !
[যে] গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি—
দেবতা-কাহিনী সম পূজি অনিবার[১]
[তা]হা মানুষের কানে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে!
লুকানো থাক্ তা' সখি হৃদয়ে আমার
ভালবাসি,—শুধায়োনা কারে ভালবাসি !
সে নাম কেমনে সখি কহিব প্রকাশি ?
আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার !
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি[২] পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে
দিন২[৩] পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি—
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার ![৪]
তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হারে—
তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার !

—॥—

রবীন্দ্র-সদন সংগ্রহে রক্ষিত ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (পৃ. ৯) এটি পাওয়া যায়।
উদ্ধৃতাংশ ভগ্নহৃদয় প্রথম সর্গে মুরলার উক্তি রূপে মুদ্রিত।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, (১২৮৭ কার্তিক), পৃ. ৩৪০ ;
ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৮, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩০ ১৩১
রবিচ্ছায়া (১২৯২) বিবিধসঙ্গীত অংশ পৃ. ৮৯ ;

টীকা: পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ইষ্ট দেবতার মন্ত্র সে যেন আমার : ভারতী
ইষ্ট-দেব-মন্ত্র সম পূজি অনিবার : ভগ্নহৃদয় ; রবিচ্ছায়া

২ ক্ষুদ্র এই বন-ফুল : রবিচ্ছায়া

৩ দিন

৪ 'রবিচ্ছায়া'র পাঠ এখানেই সমাপ্ত

পাণ্ডু. পৃ. ৭০/৬৬খ (৬)

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে —
মনে আছে কত খেলা[১]— খেলিতাম ছেলেবেলা[২]—
ফুল তুলিতাম মোরা[৩] দুইটি আঁচল ভোরে।
যতদিন ছিনু সুখে[৪]—দুই জনে বুকে বুকে[৫]
জানিতাম নাকো আমি[৬] ভালবাসি তোরে।
অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন
ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন —
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী
তখন জানিনু সখি তোরে[৭]—ভালবাসি —

—॥—

এই গান প্রথমেই ভগ্নহৃদয়-গ্রন্থে প্রথম সর্গের শেষে গান-রূপে মুদ্রিত হয়েছে। ভারতী-পত্রিকায় প্রকাশিত ভগ্নহৃদয়-প্রথম সর্গের শেষে এ-গানটি মুদ্রিত হয়নি।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৮, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২) পৃ. ৯০ ; গীতবিতান (১৩৬৭ আশ্বিন), পৃ. ৭৭০

টীকা : পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মনে আছে ছেলেবেলা

২ কত যে খেলেছি খেলা : রবিচ্ছায়া, গীতবিতান
কত খেলিয়াছি খেলা : ভগ্নহৃদয়

৩ ফুল তুলিয়াছি কত : ভগ্নহৃদয়
কুসুম তুলেছি কত : রবিচ্ছায়া, গীতবিতান

৪ ছিনু সুখে যতদিন

৫ দুজনে বিরহহীন

৬ তখন কি জানিতাম

৭ কত

পাণ্ডু. পৃ. ২৬/১৪খ (৬)

কে আমার সংশয় মিটায় ?
কে বলিয়া দিবে,[১] ভালবাসে কি আমায় ?
তাঁর প্রতি দৃষ্টি, হাসি, তুলিছে তরঙ্গরাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায় ?
পারিনে ২[২] আর — বহিতে সংশয় ভার
চরণে ধরিয়া তার শুধাইগে[৩] গিয়া
হৃদয়ের এ সংশয় দিই[৪] মিটাইয়া
কিন্তু এ সংশয় ভালো[৫]—পাছে গো সত্যের [আলো]
ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি—
পাছে এ আশার মাথে পড়ে গো অশনি[৬]

রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে রক্ষিত 'ভগ্নহৃদয়' এর স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (পৃ. ৪৮-৪৯) এই কবিতাটি পাওয়া যায়।
উদ্ধৃতাংশ ভগ্ন হৃদয় পঞ্চম সর্গে নীরদের উক্তি-রূপে মুদ্রিত।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৭ মাঘ), পৃ. ৪৭৬ ; ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৫০ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৪

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি এবং পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কে বলি দিবে সে
২ পারিনে
৩ শুধাইব : ভারতী, ভগ্নহৃদয়
৪ দিব : ঐ ঐ
৫ সংশয়ো ভাল
৬ হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি।

পাণ্ডু. পৃ. ২৬/১৪খ (৪)

শুধু যদি বলি সখা[১] ভালবাসি তারে[২] —
এ মনের কথা যেন ফুরায় যে নারে[৩] —
ভালবাসা২[৪] সবাইত কয় —
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময় —
প্রতি কাজে প্রতি পলে, সবাই যে কথা বলে —
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয় !
মনে হয় যেন সখা[৫] এত ভালবাসা ;
কেহ ভালবাসে[৬] নাই—কারো মনে আসে নাই
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা !

রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে রক্ষিত স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও এটি পাওয়া যায় (পৃ. ৫৯)।
উদ্ধৃতাংশ ভগ্নহৃদয় ষষ্ঠ সর্গে মুরলার প্রতি কবির উক্তিরূপে মুদ্রিত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী, (১২৮৭ ফাল্গুন), পৃ. ৫০৯-১০ ; ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৬১, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৩

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি এবং পত্রিকায় ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সখি
২ তায়
৩ তাহে না ফুরায়
৪ ভালবাসা
৫ সখি
৬ কেহ কারে বাসে

পাণ্ডু. পৃ. ৬২/৩২খ (১)

কি হোল আমার ? বুঝিবা স্বজনি[১]
হৃদয় হারিয়েছি[২] —
প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে
মন লোয়ে সখি গেছিনু খেলাতে
মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে
মন ফুল দলি চলি বেড়াইতে
সহসা স্বজনি[৩], চেতনা পাইয়া[৪]
সহসা স্বজনি [৫]দেখিনু চাহিয়া[৬]
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি[৭] !
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে[৮]
হৃদয় হারিয়েছি[৯]
যদি কেহ সখি দলিয়া যায় ?
তার পর দিয়া চলিয়া যায় ?
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায় ?

রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে রক্ষিত ভগ্নহৃদয়-এর স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (পৃ. ৮৫-৮৭) এই কবিতাটি পাওয়া যায়।
উদ্ধৃতাংশ ভগ্নহৃদয় নবম সর্গে নলিনীর গানরূপে মুদ্রিত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৮৬ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ. ১৯১-৯২ : রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ৮২ ৮৩

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সখি : রবিচ্ছায়া ; সজনি : ভগ্নহৃদয়
২ হৃদয় আমার হারিয়েছি : রবিচ্ছায়া
৩ সজনি
৪ পেয়ে : রবিচ্ছায়া
৫ সজনি
৬ চেয়ে : রবিচ্ছায়া
৭ হৃদয় আমার হারিয়েছি : ঐ
৮ গিয়ে
৯ হৃদয় আমার হারিয়েছি ,

পাণ্ডুলিপির ১২ ও ১৩-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি 'রবিচ্ছায়া'তে ৩ ও ৪-সংখ্যক।

পাণ্ডু. পৃ. ৬২/৩২ খ (২)

আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর
আমার মনের কামিনী পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর —
চিরদিন সখি হাসিত[১] খেলিত
জোছনা আলোয়[২] নয়ন মেলিত[৩]
হাসি [পরিমলে] অধর ভরিয়া
[লোহিত রেণুর সিঁদু]র পরিয়া

পাণ্ডু. পৃ. ১৯/১১ক

ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি[৪] !
এখনো যদি গো খুঁজিয়া পাই
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ
আমার সাধের কুসুম খানি
এখনো স্বজনি[৫] একটি পাপড়ি
ঝরেনি তাহার জানি লো জানি
শুধু হারায়েছে খুঁজিয়া পাইলে
এখনো[৬] তাহারে কুড়ায়ে আনি —

উদ্ধৃতাংশ পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৮৭ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ৮৩

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বাতাসে : ভগ্নহৃদয়

২ আলোকে : ঐ , রবিচ্ছায়া

৩ 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে এই ছত্রের পর ৪টি ছত্র বাদ। তারপর 'সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায় সজনি হারিয়েছি' ছত্র দুটি দিয়েই রবিচ্ছায়া'র পাঠ শেষ করা হয়েছে।

৪ কোথায় সজনি হারিয়েছি : রবিচ্ছায়া। রবিচ্ছায়ার পাঠ এখানেই সমাপ্ত।

৫ সজনি

৬ এখনি

ত্বরা কর্ তবে ত্বরা কর্ সখি[১] —
হৃদয় খুঁজিতে যাই
শুকাবার আগে ছিঁড়িবার আগে
হৃদয় আমার চাই !

—০—

পাণ্ডু. পৃ. ২৬/১৪খ (৫)

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার ?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরেনা কো[২] আর !
তোমার সৌন্দর্য্যভারে — দুর্ব্বল-হৃদয় হা রে—
অভিভূত হোয়ে[৩] যেন পোড়েছে[৪] আমার!
এস হৃদে এস দেবি — আজন্ম তোমারে সেবি —[৫]
ঘুচাইব হৃদয়ের যন্ত্রণা আঁধার ![৬]
তোমার চরণে দিব[৭] প্রেম উপহার
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার —
নাইবা দিলে তা বালা, থাক হৃদি করি আলা
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার ।

এই পৃষ্ঠার প্রথমাংশ পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি ।

পরবর্তী গান ভগ্নহৃদয় দশম সর্গের শেষে মুদ্রিত । এই গান ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি । রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রক্ষিত ভগ্নহৃদয়-এর স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও এটি পাওয়া যায়। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে 'গান' শিরোনামে লিখিত (পৃ. ৯৭-৯৮) এটি মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত পাঠের সংশোধিত রূপ। এই সংশোধিত পাঠই ভগ্নহৃদয় গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে ।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ৮৭-৮৮ , ৯৫, অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৩ , ১৯৯

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থে পাঠান্তর

১ তোরা
২ ধরেনা গো
৩ হ'য়ে
৪ প'ড়েছে
৫ এস তবে হৃদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে
৬ ঘুচাও এ হৃদয়ের সকল আঁধার ,
৭ দিনু

পাণ্ডু. পৃ. ১৯ক/১১ক (২)

এস মন ! এস, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত —
আপনার হোয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহি গো পরের মত !
আমি যাই এক দিকে মন মোর !
তুমি যাও আর দিকে
যার কাছ হোতে ফিরাই নয়ন
তুমি চাও তার দিকে !
তার চেয়ে এস দুজনে মিলিয়ে
হাত ধোরে যাই এক পথ দিয়ে —
আমারে ছাড়িয়ে অন্য কোন খানে
[যেওনা কখনো আর !]

পাণ্ডু. পৃ. ২০/১১খ

পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে ?
দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে ?
তবে কেন তুই না শুনে বারণ
যাস্‌রে পরের দ্বার ?
তুমি আমি মোরা থাকিতে দুজন
বল্‌ দেখি হৃদি কিবা প্রয়োজন
অন্য সহচরে আর ?
এত কেন সাধ বল দেখি মন
পর ঘরে যেতে যখন তখন —
সেথা কিরে তুই আদর পাস্‌ ?
বল্‌ ত কত না সহিস্‌ যাতনা —
দিবানিশি কত সহিস্‌ লাঞ্ছনা
তবু কি রে তোর মেটেনি[১] আশ ?

রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (পৃ. ১১২-১৪) এটি পাওয়া যায়।

উদ্ধৃতাংশ ভগ্নহৃদয় দ্বাদশসর্গে নলিনীর গান-রূপে মুদ্রিত।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১০৮-৯ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৯

টীকা : স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মিটেনি

পাণ্ডু. পৃ. ২০/১১খ

আয় ফিরে আয়! মন! ফিরে আয়—
দোঁহে এক সাথে করিব বাস!
অনাদর আর হবে না সহিতে
দিবস রজনী পাষাণ বহিতে
মরমে দহিতে মুখে না কহিতে
ফেলিতে দুখের শ্বাস!
শুনিলিনে কথা—আসিলিনে হেথা
ফিরিলিনে একবার?
সখিলো দুরন্ত হৃদয়ের সাথে
পেরে উঠিনে ত আর!
"নয়রে সুখের খেলা ভালবাসা"
কত বুঝালেম তায়—
হেরিয়া চিকন সোনার শিকল
খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল
খেলাতে ২[১] না জেনে না শুনে
[জড়ায় নিজের পায়]

পাণ্ডু. পৃ. ২১/১২ক

বাহিরিতে চায় বাহিরিতে নারে
করে শেষে হায় হায়!
শিকল ছিঁড়িয়া[২] এসেছে ক'বার
আবার কেন রে যায়?
চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি সুখ পায়?
তিলেক রহেনা আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া
স্বজনি বল্ কি করি?

—॥—

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় সংকলিত ভগ্নহৃদয়-দ্বাদশ সর্গের নলিনীর গান-এর শেষাংশ।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিতপাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১০৯-১১০; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০

টীকা: স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি এবং গ্রন্থে পাঠান্তর

১· খেলাতে

২ ছিঁড়িয়ে

নূতন উষা*

পাণ্ডু. পৃ. ৩৯/২১ক

[স]ংসারের পথে পথে, মরীচিকা অন্বেষিয়া
ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে,
[তাই] বলি একবার, আমারে ঘুমাতে দাও,
শীতল করি এ হৃদি স্নিগ্ধ বিরামের[১] জলে।
শ্রান্ত এ জীবনে মোর, আসুক নিশীথ কাল,
বিস্মৃতি আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখ জ্বালা,
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে; ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে সমুদ্রমাঝে[২] জীবনের স্রোতমালা!

* রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (সংখ্যা ৯৩। পৃ. ১৯৩-৯৪) এই রচনাটি পাওয়া যায়। তাতে রচনার শিরোনাম-স্থলে 'ললিতা' লিখিত আছে।

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থের মুদ্রিতপাঠ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে হুবহু এক। ব্যতিক্রম কেবল একটি শব্দের বানানে—১৭ সংখ্যক ছত্রে পাণ্ডুলিপিতে আছে 'কাঁদিয়া ওঠে'; মুদ্রিত গ্রন্থে আছে 'কাঁদিয়া উঠে'।

স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি (সংখ্যা ৯৩) দেখে মনে হয় এটি ভগ্নহৃদয় গ্রন্থের প্রেস-কপি। কারণ এর প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই ছাপাখানার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এর দ্বিতীয় সর্গের (পৃ. ২৭) আরম্ভে মার্জিনে কবি নিজের হাতে লিখেছেন

'কাপি ফেরত চাই / নষ্ট করা না হয় / R. T'.

ওই পৃষ্ঠার আরম্ভে এক কোণে ভগ্নহৃদয়ের দ্বিতীয় সর্গের রচনাস্থল এবং তারিখও লেখা আছে—'S. S. OXUS / -February/1880'

ঐ বৎসরেরই অক্টোবর মাসে (১২৮৭ কার্তিক) ভারতী পত্রিকায় ভগ্নহৃদয় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং পরের বছর ফেব্রুআরি পর্যন্ত (১২৮৭ ফাল্গুন) ভারতীতে ভগ্নহৃদয়ের প্রথম ছয় সর্গ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

সম্পূর্ণ ভগ্নহৃদয়-গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ শকাব্দ ১৮০৩ (১৮৮১ খৃঃ জুন ২৩। ১২৮৮ আষাঢ় ১০)। মুদ্রিত গ্রন্থে ভগ্নহৃদয়ের মোট চৌত্রিশটি সর্গ পাওয়া যায়।

মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত উদ্ধৃত 'নূতনউষা' শীর্ষক রচনাটি শিরোনাম বর্জিত এবং আংশিকভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় 'ললিতা' [র উক্তি] রূপে ভগ্নহৃদয় উনত্রিংশ সর্গের অন্তর্গত হয়েছে। এই অংশ কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রথমেই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত এর দ্বিতীয় অংশ হিমালয় শিরোনামে রচিত কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভগ্নহৃদয় গ্রন্থ প্রকাশের তিনবছর আগে (১২৮৪) ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

'নূতনউষা' শিরোনামটি কবি মালতীপুঁথির মূল খসড়ালিপিতে বর্জন করেছেন এরূপ মনে হয়; কিন্তু এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়না বলে উক্ত শিরোনাম এখানেও অবর্জিত রইল।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র- ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৭৮; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৯

টীকা: মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বিরামের স্নিগ্ধ জলে

২ মহাসমুদ্রে

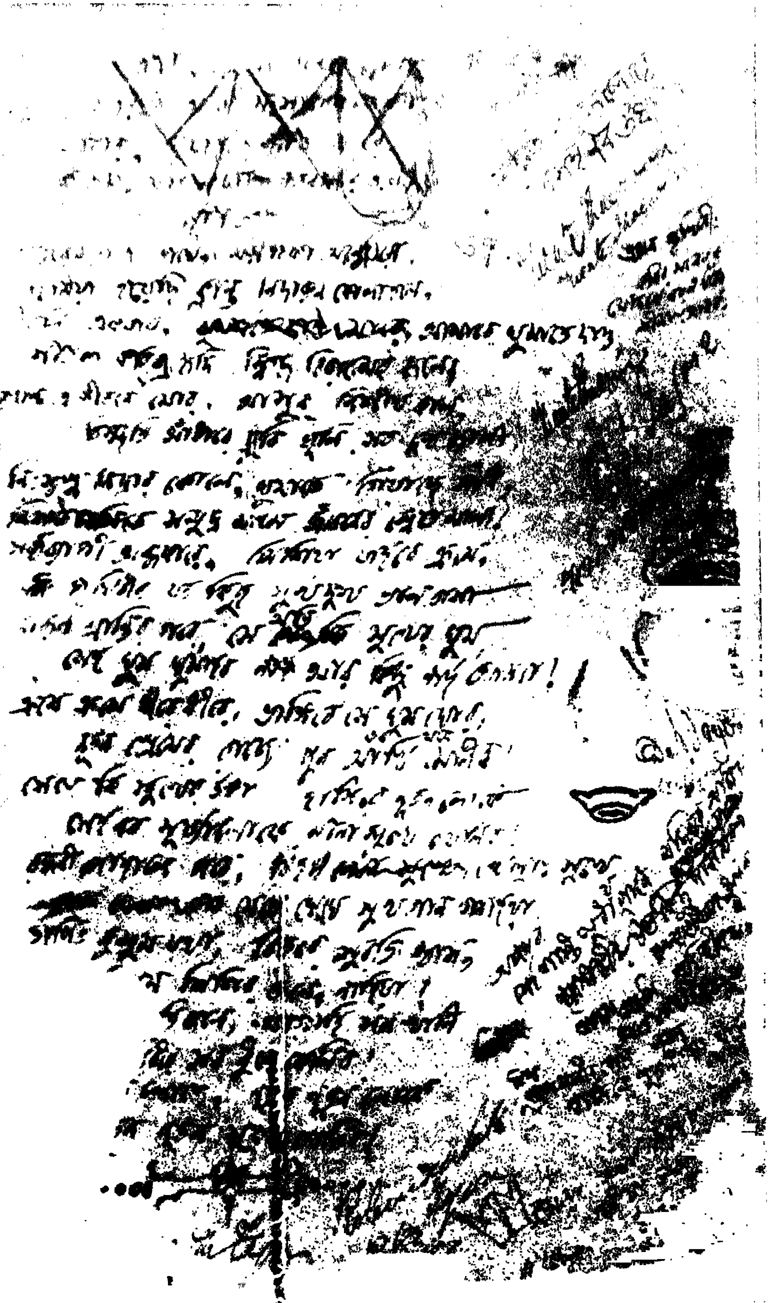

মালতী-পুঁথি : পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 39/২১ক

পাণ্ডু. পৃ. ৩৯/২১ক

সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারে, মিশিয়া যাইবে ক্রমে,
পৃথিবীর যতকিছু সুখ দুখ ভালবাসা
দারুণ শ্রান্তির পরে, সে অতি সুখের[১] ঘুম,
সেই ঘুম ঘুমাইব আর কিছু[২] নাই আশা !
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, ভাঙ্গিবে সে ঘুমঘোর,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি[৩] মেলিব।
সে যে কি সুখের উষা, হাসিবে নূতন লোকে
সেই নব সূর্য্যালোকে মনোসুখে খেলিব !
রজনী পোহালে পরে, বিহঙ্গ খেলায় সুখে
মেঘে মেঘে সুখগান গাহিয়া
তাপিত কুসুম যথা, বিতরে সুরভি শ্বাস,
[বিম]ল শিশির জলে নাহিয়া।
[অপার বিস্ম]তিজলে, অবগাহি মন খানি
[দুখজ্বালা পৃথি] বীর সব ধুয়ে ফেলিব !
[নূতন-জীবন] লোয়ে, নূতন নূতন লোকে
[নূত]ন নূতন সুখে খেলিব।

—॥—

উদ্ধৃতাংশ পূর্ব্ববর্তী পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; সংকলয়িতার অনুমিত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৭৮-১৭৯; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬১

মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত পাঠের প্রথম থেকে অষ্টম ছত্র পর্যন্ত মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়। নবম ও দশম ছত্র মুদ্রিত পাঠে বর্জিত। মুদ্রিত পাঠের ৯ থেকে ২৪ সংখ্যক ছত্র পর্যন্ত অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত; কিন্তু ২৫ ও ২৬ সংখ্যক ছত্র সামান্য পরিবর্তনসহ মালতীপুঁথির ১১ ও ১২ সংখ্যক ছত্রের অনুরূপ। মালতীপুঁথির ৯ম ও ১০ম ছত্র এবং ১৩শ থেকে ২৪শ পর্যন্ত মোট ১৪টি ছত্র মুদ্রিত পাঠে গৃহীত হয়নি।

টীকা : মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ সে অতি সুখের স্থলে আসে যে দারুণ

২ কিছু নাই আশা স্থলে কোন নাই আশা

৩ পাণ্ডুলিপিতে 'পুন আঁখি মেলিব' স্থলে 'আঁখি যবে মেলিব' এরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছায় কবি সম্ভবত ছত্রের উপরে 'যবে' শব্দটি লিখেছিলেন; কিন্তু 'পুন' শব্দটি বাদ দেননি।

পাণ্ডু. পৃ. ৪০/২১খ সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নূতন জীবন লোয়ে[১]
নূতন নূতন রাজ্যে মনোসুখে খেলিব,[২] ২৬
যত কিছু পৃথিবীর, দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি জলে মুছে সব ফেলিব ২৮
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া ৩০
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব একদিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া — ৩২
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত,
আঁধার আকাশ ঘেরি চারিদিকে[৩] ছুটিছে, ৩৪
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, বিশাল এ[৪] প্রকৃতির
অভ্যন্তর হোতে[৫] এক গীতধ্বনি উঠিছে ! ৩৬
অনন্ত গভীর ভাবে[৬], বিস্ফারিত হবে মন,
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া ? ৩৮
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
অনন্ত গভীর সুখে রহিব গো ডুবিয়া ! ৪০

উদ্ধৃতাংশ পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৪) ভাদ্র সংখ্যার ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'হিমালয়' শীর্ষক কবিতা। মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত 'নূতন-উষা' শীর্ষক কবিতার মোট ৪০টি ছত্রের মধ্যে মাত্র ১০টি ছত্র (১ম থেকে ৮ম এবং ১১শ ও ১২শ ছত্র) 'ললিতা' শিরোনামে ভগ্নহৃদয়ে ২৯শ সর্গে মুদ্রিত হয়েছে। 'নূতনউষা'র ৯ম, ১০ম ছত্র এবং ১৩শ থেকে ২৪শ পর্যন্ত ১৪টি ছত্র কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে উক্ত কবিতার ২৫শ থেকে ৪০শ পর্যন্ত শেষ ষোলটি ছত্র যৎসামান্য পরিবর্তনসহ 'হিমালয়' শীর্ষক কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (দ্র. 'হিমালয়' ছত্রসংখ্যা ৩৭-৫২)।

মালতীপুঁথির একই পাতার দুই পৃষ্ঠায় লিখিত 'নূতনউষা' কবিতাটির শেষাংশ (ছত্র ২৫-৪০) 'হিমালয়' কবিতার শেষ ১৬টি ছত্ররূপে ভারতী পত্রিকায় আগে আত্মপ্রকাশ করেছে (১২৮৪ ভাদ্র); এবং উক্ত কবিতার প্রথমাংশ (ছত্র ১-৮ এবং ১১-১২) প্রকাশিত হয়েছে প্রায় চার বছর পরে (১২৮৮ আষাঢ় ১০। ১৮৮১ খৃঃ জুন ২৩)। এ থেকে মনে হয় 'হিমালয়', 'নূতনউষা' এবং 'ললিতা'র উক্তিরূপে মুদ্রিত কবিতা এই তিনটিই মূলতঃ একই উৎস থেকে প্রবাহিত। মালতীপুঁথির আলোচ্য কবিতাটিকে যদি ভগ্নহৃদয়ের অংশরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে একথাও স্বীকার্য যে ভগ্নহৃদয়ের রচনা আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেরও পূর্বে, যে তারিখটি শৈশবসঙ্গীত রচনারও পূর্ববর্তী।

টীকা : 'হিমালয়' কবিতায় পাঠান্তর

১	ল'য়ে :	হিমালয় কবিতা—৩৭ সংখ্যক ছত্র			
২	নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব	ঐ	৩৮	„	ছত্র
৩	নিঃশবদে	ঐ	৪৬	„	ছত্র
৪	মহাস্তব্ধ	ঐ	৪৭	„	ছত্র
৫	হ'তে	ঐ	৪৮	„	ছত্র
৬	গভীর আনন্দভরে	ঐ	৪৯	„	ছত্র
৭	ডুবিব অনন্ত প্রেম মনঃ প্রাণ ভরিয়া	ঐ	৫২	„	ছত্র

[illegible]

পাণ্ডু. পৃ. ২১/১২ক

বায়ু! বায়ু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা?
কৌতুকে আকুল?
আমি একটি জুঁই ফুল!
সারা রাত এ মাথায় পোড়েছে শিশির
গণেছি কেবল —
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত, হে সমীর!
অতি হীন-বল!
ভাঙ্গা বৃন্তে ভর করি রোয়েছি[১] জীবন ধরি
জীবনে উদাস —
ওগো উষার বাতাস!
শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে চাহিয়া রয়েছে[২] ভুঁয়ে
মর' মর' একটি জুঁই ফুল!
ছুঁয়োনা ২ এরে[৩] — এখনি পড়িবে ঝোরে
সুকুমার একটি জুঁই ফুল—
ও ফুল গোলাপ নয় — সুষমা সুরভিময়[৪]
নহে চাঁপা নহে গো বকুল
ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী
ও শুধু একটি জুঁই ফুল!

পাণ্ডু. পৃ. ২২/১২খ

ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায়?
হে প্রভাত বায় — ?
প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে?
হাসুক্ সরসে!
শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে
কাঁদুক্ হরষে!

উদ্ধৃতাংশ ভগ্নহৃদয় চতুস্ত্রিংশ সর্গে ললিতার গানরূপে মুদ্রিত।
মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৯৩-১৯৪; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৯-২৭০

টীকা: মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ রয়েছি

২ রোয়েছে

৩ কাছেতে এস' না সোরে

৪ (সুষমা সুরভিময়)

পাণ্ডু. পৃ. ২২/১২ খ

ও এখনি বৃন্ত হোতে কঠিন মাটিতে
পড়িবে ঝরিয়া
শান্তিতে মরে গো যেন মরিবারে কালে
যাও গো সরিয়া।[১]
ওরে কি শুধাতে আছে প্রেমের বারতা
মর মর যবে
একটি কহেনি কথা অনেক সহেছে—
মরমে ২[২] কীট অনেক বহেছে
আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন ?
কথা নাহি কবে !
ও যখন মাটি পরে পড়িবে ঝরিয়া
ওরে লোয়ে খেলাস্‌নে তুই !
উড়ায়ে যাস্‌নে লোয়ে হেথা হোতে হেথা[৩]
ক্ষুদ্র এক যুঁই[৪]—
যেখানে[৫] খসিয়া পড়ে, সেথা যেন থাকে পোড়ে
ঢেকে দিস্ শুকানো পাতায় !
ক্ষুদ্র জুঁই ছিল কি না কেহইত জানিত না
মরিলেও জানিবেনা তায় !
কাননে হাসিত চাঁপা হাসিত গোলাপ
আমি যবে মরিতাম কাঁদি
আজো হাসিবেক তারা শাখায় ২[৬]
ভুজে ভুজ[৭] বাঁধি

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি। ভগ্নহৃদয় চতুস্ত্রিংশ সর্গে মুদ্রিত 'ললিতার গান' এর শেষাংশ। মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৯৪-১৯৫ ; অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭১।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মুদ্রিতপাঠে এই ছত্রের পর আছে (পরবর্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আটটিছত্র) 'মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে…প্রভাত পবন'। পাণ্ডুলিপিতে এ-অংশ স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় গানের শেষদিকে লিখিত।

২ মরমে

৩ হোথা : মালতী পুঁথিতে অনবধানতাবশতঃই কবি 'হেথা' লিখে থাকবেন। ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতেও (নং৯৩) 'হোথা' পাওয়া যায়।)

৪ জুঁই

৫ যেথাই

৬ শাখায়

৭ হাতে হাত

পাণ্ডু. পৃ. ২২/১২ খ

সে অজস্র হাসি মাঝে সে হরষ রাশি মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি ![১]

পাণ্ডু. পৃ. ৫২/২৭ খ

মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে
দেখিবারে—ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
অভিমান কোরে[২] বুঝি আছে।
নয় ২[৩] তাহা নয়, সে সকল খেলা নয়
ফুরায় জীবন,
তবে যাও চলে[৪] যাও—আর কোন ফুলে যাও
প্রভাত পবন !

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভগ্নহৃদয় (১৮০৩ শক), পৃ. ১৯৬, ১৯৪ অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭০

টীকা: মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠান্তর

১ গ্রন্থের পাঠ এখানে সমাপ্ত। পাণ্ডুলিপিতে এরপর আরও যে-আটটি ছত্র পাওয়া যায় (দ্র. পৃ. ৫২/২৭খ) সেই ছত্রগুলি গ্রন্থে ২৮ সংখ্যক ছত্রের পর মুদ্রিত (দ্র. পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটীকা ১)।

২ ক'রে: রবীন্দ্র-রচনাবলী

৩ নয়

৪ চোলে: ভগ্নহৃদয়
চ'লে: রবীন্দ্র-রচনাবলী

[ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী]

পাণ্ডু. পৃ. ২৪/১৩খ (২)

গহির নীদমে অবশ[১] শ্যাম মম
অধরে বিকশত হাস—
মধুর বদনমে মধুর ভাব অতি
কয়্‌স[২] পায় পরকাশ।
চুম্বনু শত শত—চন্দ্র বদনরে—
তবহুঁন পূরল আশ ;
অতি ধীরে ময় হৃদয়[৩] রাখনু
তবহুঁন[৪] মিটল তিয়াষ !
শ্যাম সুখে তুঁহু—নীদ যাও পহু—
মম[৫] এ প্রেমময় উরষে—
অনিমিখ নয়নে সারা রজনী
হেরব মুখ তব হরষে
শ্যাম ! মুখে তব—মধুর অধরমে
হাসি[৬] বিকাশত কায়—
কোন্ স্বপন অব দেখত মাধব
কহবে কোন হমায়

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন। বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী (১২৯১), পৃ, ২৮-৩০। এই গ্রন্থে মোট ২১টি গান মুদ্রিত আছে। তন্মধ্যে ১৩টি (সংখ্যা ৮-১১ এবং ১৩-২১) 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪-১২৮৮ ও ১২৯০) প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান পদটি ভারতীতে প্রকাশিত হয়নি। প্রথমেই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এই পদ আর মুদ্রিত হয়নি।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ বিবশ
২ কিয়ে
৩ হৃদয়ে
৪ নহি নহি
৫ মঝু
৬ হাস

পাণ্ডু. পৃ. ২৪/১৩খ (২)

এ সুখ-স্বপনে ময়ক[১] কি দেখত,
হরষে বিকশত হাসি ?
শ্যাম— শ্যাম মম—কয়সে[২] শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি !'
জনম ২[৩] মম—প্রাণ পূর্ণ করি
থাক' হৃদয় করি আলা—
তুঁহুক পাশ রহি—হাসত হাসত[৪]
সহব সকল দুখ জ্বালা !
বিহঙ্গ কাহ তু বোলন লাগলি ?
শ্যাম ঘুমায় হমারা !
রহ-রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন ধারা !
তারা-মালিনী—মধুরা যামিনী
ন যাও-ন যাও বালা
নিরদয় রবি অব কাহ তু আয়লি[৫] ?
সঁপিতে[৬] বিরহক জ্বালা !

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১), পৃ. ২৯ ৩০

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ মৈক

২ কৈসে

৩ জনম

৪ হাসয়ি হাসয়ি

৫ আওলি

৬ আনলি

হমার সারা জীবন জনি কভু[১]
রজনী রহত সমান
হেরই হেরই শ্যাম মুখচ্ছবি
প্রাণ ভইত অবসান !
ভানু কহত অব—"রবি অতি নিষ্ঠুর—
নলিন-মিলন অভিলাষে—
কত শত নারী [ক] মিলন টুটাওত
ডা[রত বিরহ হুতাশে !"]

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১), পৃ.৩০

পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠার উপরের অর্ধাংশে আছে শৈশবসঙ্গীতের 'দেখে যা ২২ লো তোরা সাধের কাননে মোর' ইত্যাদি গান। ভানুসিংহের পদাবলীর বর্তমান পদটি যদিও শৈশবসঙ্গীতের উল্লিখিত গানটির প্রথম প্রকাশের (১২৮৫) ছয় বৎসর পরে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তথাপি পাণ্ডুলিপির একই পৃষ্ঠায় লেখা এই দুইটি গান রচনা মধ্যে কালের ব্যবধান আছে বলে মনে হয় না। এ-প্রসঙ্গে রচয়িতা ও গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি জানিয়েছেন,

"ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব-সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতনকালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।"

এখানে উল্লিখিত পুরাতনকালের খাতাটি সম্ভবতঃ বর্তমান মালতীপুঁথি। একমাত্র মালতীপুঁথি ছাড়া আলোচ্য পদটির অন্য কোনো খসড়ালিপির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ইহ

[রুদ্রচণ্ড]

[অমিয়ার (গান) / রাগিনী মিশ্র ললিত]

পাণ্ডু. পৃ. ১৫/৮ক

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার
চাহিয়া দেখিল[১] চারি ধার ;
সৌন্দর্য্যের[২] বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগত[৩] প্রকাশিল
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো,
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !
ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে[৪] ফুলের ঘুম-ভাঙ্গা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙ্গা।
কুসুম ভগিনী-গণ চারি দিক হতে
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোক[৫] ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।
আকাশ সুনীল আজি কিবা !
অরুণ-নয়নে হাস্য-বিভা !

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন। বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত। মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. রুদ্রচণ্ড (শকাব্দ ১৮০৩। খৃঃ ১৮৮১), পৃ. ১৪-১৫ ; সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩), পৃ. ৪-৫ , মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থ সপ্তমভাগ (১৩১০) পৃ. ১৪৭ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২) পৃ. ৯৮-৯৯ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

১৪টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ ৫৩ পৃষ্ঠার এই নাটকটি ভগ্নহৃদয় রচনার সমকালেই রচিত বলে মনে হয়। এই দুই গ্রন্থ প্রকাশ কালের ব্যবধান মাত্র ২দিন (ভগ্নহৃদয়-১৮৮১ জুন ২৩ ; রুদ্রচণ্ড-১৮৮১ জুন ২৫)।

কাব্য-গ্রন্থাবলীর 'কৈশোরক' অংশে 'আরম্ভে' শিরোনামে এই গানটি (১২-১৫ সংখ্যক ছত্র বাদে) সংকলিত। 'শিশু' কাব্যের 'ফুলের ইতিহাস' শীর্ষক কবিতার প্রথমাংশে এর ১, ২, ৩-সংখ্যক ছত্র গৃহীত হয়েছে।

১ প্রথম হেরিল : কাব্যগ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ-সপ্তম ভাগ-ভুক্ত 'শিশু'
২ আনন্দের : ঐ
৩ জগৎ : ঐ
৪ হেরিছে : ঐ
৫ চোখ

পাণ্ডু. পৃ. ১৫/৮ক

বিমল শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুম-রাজি গো
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !
মধুকর গান গেয়ে বলে
"মধু কই মধু দাও দাও !"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে "এই লও লও"

পাণ্ডু. পৃ. ১৬/৮খ

বায়ু আসি কহে কাণে[১]
"ফুল বালা পরিমল দাও"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল
"যাহা আছে সব লয়ে যাও !"
হরষ ধরে না তার চিতে
আপনারে চায়[২] বিলাইতে।
বালিকা আনন্দে[৩] কুটি কুটি
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি।
নূতন জগত[৪] দেখিরে
আজিকে হরষ এ কিরে !

—॥—

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. রুদ্রচণ্ড (শকাব্দ ১৮০৩ / খৃঃ ১৮৮১) পৃ. ১৫ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ৯৮-৯৯ ; সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলী, (১৩০৩), পৃ. ৪-৫ ; মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ, সপ্তম ভাগ (১৩১০), পৃ. ১৪৭-৪৮ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ; অচলিত সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড; পৃ. ২৮৯।

পাণ্ডুলিপির ২১—২৮ সংখ্যক ছত্র গুলি কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত 'শিশু'-কাব্যের ফুলের ইতিহাস কবিতায় ৪—১১ সংখ্যক ছত্ররূপে সংকলিত।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কানে

২ চাহে : কাব্যগ্রন্থাবলী

৩ আনন্দে কুসুম : ঐ

৪ জগৎ : ঐ

[চাঁদকবির (গান) / রাগিনী-মিশ্র গৌড় সারঙ্গ][1]

পাণ্ডু. পৃ. ১৬/৮খ

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত[2] মালতীর ফুল,
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একেলা পড়িয়া
চারিদিকে কেহ নাই আর ঃ
নিরদয় অসীম সংসার !
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা ?
কেহ না, কেহ না !
মধুকর কাছে এসে বলে,
মধু কই, মধু চাই চাই !
সবিষাদ[3] নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে কিছু নাই নাই !
কথাটি না কয়ে ধীরে ধীরে
মধুকর গেল অন্য ঠাঁই।

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন।

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. রুদ্রচণ্ড (শকাব্দ ১৮০৩, খৃঃ ১৮৮১), পৃ. ১৭, ১৮, ৩৪; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ. ২৫-২৬ ; সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩), পৃ. ৫ ; মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ-সপ্তমভাগ, (১৩১০) পৃ. ১৪৮; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯০-২৯১।

রুদ্রচণ্ড নাটিকার ৩য় দৃশ্যে পাণ্ডুলিপির ১৪-১৫-এবং ২০-২১-সংখ্যাক ছত্রগুলি বাদে ২১ ছত্র এবং ৮ম দৃশ্যে পাণ্ডুলিপির ১-৯ ও ২২—২৫-সংখ্যাক তেরো ছত্র মুদ্রিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত শিশুকাব্যের 'ফুলের ইতিহাস' কবিতায় পাণ্ডুলিপির ১—৩ এবং ১০—১৩-সংখ্যার্ক ছত্রগুলি সংকলিত হয়েছে।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কাব্যগ্রন্থাবলীতে শিরোনাম 'অবসানে'

২ চ্যুতবৃন্ত : কাব্যগ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ ভুক্ত 'শিশু' কাব্য,

৩ ধীরে ধীরে : ঐ

পাণ্ডু. পৃ. ১৩/৭ক

ফুলবালা পরিমল দাও
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে আর কি বা আছে[১]
কথাটি না কয়ে সমীরণ[২]
চলে গেল দূর দূর বন ![৩]
মধ্যাহ্ণ[৪] কিরণ চারিদিকে
খর-দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে !
ফুলটির মৃদু-প্রাণ হায়[৫]
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ।[৬]

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. রুদ্রচণ্ড (শকাব্দ ১৮০৩, খৃঃ ১৮৮১) ; পৃ. ১৭-১৮ ; রবিচ্ছায়া (১২৯২), পৃ.২৬ ; সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩), পৃ. ৫ ; মোহিত চন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩১০), পৃ. ১৪৮ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯১ ; কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'শিশু'কাব্যের 'ফুলের ইতিহাস' কবিতায় পাণ্ডুলিপির ১৬-১৯ ছত্রগুলি গৃহীত হয়েছে।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ 'শিশু' কাব্যের মুদ্রিত পাঠ এখানেই সমাপ্ত

২-৩ এই দুটি ছত্র মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায় না

৪ মধ্যাহ্ন : রুদ্রচণ্ড ; রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড

৫ ক্ষীণ প্রাণ : কাব্য-গ্রন্থাবলী

৬ হল অবসান : ঐ

[সন্ধ্যাসঙ্গীত][1]

[দুদিন][2]

পাণ্ডু. পৃ. ৬১/০২ক

ফুরালো দুদিন[3]
কেহ নাহি জানে এই দুইটি দিবসে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে একটি হৃদয়ে।
দুইটি দিবস
চিরজীবনের স্রোত দিয়াছে ফিরায়ে —
এই দুই দিবসের পদচিহ্নগুলি
শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত।
এই দুই দিবসের হাসি অশ্রু মিলি
হৃদয়ে স্থাপিবে চির বসন্ত বরষা

—॥—

এই যে ফিরান মুখ — চলিনু পূরবে
আর কি গো[4] এ জীবনে ফিরে আসা হবে
কত মুখ দেখিয়াছি — দেখিব না আর —

উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন। কবিতাটির আরম্ভের অংশ মালতী পুঁথিতে নেই। মুদ্রিতপাঠে দেখা যায় পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত অংশের পূর্বে আরও পঁচিশ ছত্র যুক্ত হয়েছে। 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য'-স্বাক্ষরে ভারতী পত্রিকায় 'দুদিন' শিরোনামে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র, ভারতী (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ), পৃ. ৫৯ ৬০ ; সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ ৬৯-৭০ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (১৩৪৬ আশ্বিন), পৃ. ৩২-৩৩।

পাণ্ডুলিপির ১ এবং ১০-১২ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিতপাঠে যথাক্রমে ২৬ এবং ৩০-৩২ সংখ্যক।

„ ২—৭-সংখ্যক ছত্রগুলি ৬২-৬৭ সংখ্যক ছত্ররূপে কিছু কিছু পরিবর্তনসহ পুনর্লিখিত এবং মুদ্রিতপাঠে ৮২ ৮৭ সংখ্যক ছত্ররূপে গৃহীত।

„ ৮, ৯- „ „ মুদ্রিতপাঠে গৃহীত হয়নি।

---

১ পাণ্ডুলিপিতে অনুল্লিখিত।

২ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত। কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীত-গ্রন্থের অন্তর্গত।

৩ ছত্রটি পাণ্ডুলিপিতে ৫৭-সংখ্যক ছত্ররূপে পুনর্লিখিত।

৪ আর কি রে : সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী।

পাণ্ডু. পৃ. ৬১/৩২ক

ঘটনা ঘটিবে শত[১] বরষ ২[২] কত[৩]
জীবনের পর দিয়া হোয়ে[৪] যাবে পার —
হয় তো গো[৫] একদিন অতি দূরদেশে
আসিয়াছে সন্ধ্যা হোয়ে[৬] বাতাস যেতেছে বোয়ে[৭]
একেলা নদীর তীরে[৮] রহিয়াছি বোসে[৯]
হু হু কোরে[১০] উঠিবেক সহসা এ হিয়া —
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা, সহসা দিবেক[১১] দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া —
একটি গানের ছত্র পরিবেক মনে
দুয়েকটি[১২] সুর তার উদিবে স্মরণে !
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ) পৃ. ৫৯ ; সন্ধ্যাসঙ্গীত (১২৮৮), পৃ. ৭০ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড (১৩৪৬ আশ্বিন), পৃ. ৩২-৩৩।

১ কত : সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-বচনাবলী
২ বরষ
৩ শত : সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী
৪ হয়ে : ঐ , ঐ
৫ হয়ত বা : ঐ
৬ হয়ে : ঐ, রবীন্দ্র-রচনাবলী
৭ বয়ে : ঐ, ঐ
৮ ধারে : ঐ, ঐ
৯ বসে : ঐ, ঐ
১০ করে : ঐ, ঐ
১১ দিবে রে : ঐ ; দিবে যে : রবীন্দ্র-রচনাবলী
১২ দু-একটি : রবীন্দ্র-রচনাবলী

পাণ্ডু. পৃ. ৬১/৩২ক

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি
ভুলিব — যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি —
কিন্তু আহা দুদিনের তরে হেথা এনু
একটি কোমল হৃদি[১] ভেঙ্গে রেখে গেনু !
তার সেই মুখখানি কাঁদো কাঁদো মুখ
এলানো কুন্তল জাল [২]ছাইয়াছে বুক
বাষ্পময় আঁখি দুটি — অনিমেষ[৩] আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে অঞ্চল লুটিছে
থেকে ২[৪] উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে
সেই সে মুখানি আহা করুণ মুখানি
সুকুমার কুসুমটি জীবন আমার
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটেনা ২[৫]তবু তিয়াষ আমার
শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতি নিশি — হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল পাশে[৬]আকুল নয়নে ![৭]

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি। মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ) পৃ. ৫৯ ; সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ৭০ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১৩৪৬ আশ্বিন), পৃ. ৩২-৩৩
পাণ্ডুলিপির ২৮-৪১ সংখ্যক ছত্র ভারতী ও সন্ধ্যাসংগীত ১ম সংস্করণ এর মুদ্রিতপাঠে যথাক্রমে ৪৮-৬৪ সংখ্যক। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে গৃহীত পাঠে পাণ্ডুলিপির ২৮-৪১ সংখ্যক ১৪টি ছত্র পাওয়া যায়না।

১ প্রাণ : সন্ধ্যাসঙ্গীত
২ কুন্তল জালে : ভারতী, সন্ধ্যাসঙ্গীত
৩ অনিমিষ : ভারতী
অনিমিখ : সন্ধ্যাসঙ্গীত
৪ থেকে : ভারতী, সন্ধ্যাসঙ্গীত
৫ মেটেনা : ঐ ঐ
৬ কুন্তল জাল : ভারতী
আকুল কেশে : সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী
৭ আকুল নয়ন : ঐ ঐ

পাণ্ডু. পৃ. ৬১/৩২ ক

সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে ৪৬
নক্ষত্র তারার মাঝে[১] উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা ২[২] সেই মুখ তার— ৪৮
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার !
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে ৫০
"গেলে সখা ? গেলে ?"[৩] সেই ভাঙ্গা ২[৪] স্বরে ![৫]
সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস ৫২
স্নিগ্ধ ছায়া[৬] সুকুমার ফুলবন পরে
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্ত্তের তরে ৫৪
কোমলা যুঁথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান[৭] বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল ৫৬

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিতপাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ); পৃ. ৬০ ; সন্ধ্যাসঙ্গীত, ১ম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ৭১-৭২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১৩৪৬ আশ্বিন), পৃ ৩৩।

পাণ্ডুলিপির ৪৫-৫৬ সংখ্যাক ছত্র ভারতী ও সন্ধ্যাসঙ্গীত ১ম সংস্করণের মুদ্রিতপাঠে ৬৫-৭৬ সংখ্যাক (ব্যতিক্রম : পাণ্ডুলিপির ৫৩-৫৪ সংখ্যাক ছত্র দুটি সন্ধ্যাসঙ্গীত ১ম সংস্করণের মুদ্রিতপাঠে যথাক্রমে ৫৪-৫৩ সংখ্যাক , অর্থাৎ আগের ছত্রটি পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে)।

পাণ্ডুলিপির ৫২-৫৬ সংখ্যাক ছত্র রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের মুদ্রিতপাঠে গৃহীত হয়নি।

১ ···গ্রহের মতো : রবীন্দ্র-রচনাবলী

২ ···রেখা

৩ "যাবে তবে ? যাবে ?"

৪ ···ভাঙ্গা···

৫ এরপর ৫টি ছত্র (৫২-৫৬) রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত

৬ স্নিগ্ধচ্ছায়া : ভারতী, সন্ধ্যাসঙ্গীত

৭ ম্রিয়মাণ : সন্ধ্যাসঙ্গীত

পাণ্ডু. পৃ. ৬১/৩২ ক

ফুরালো দুদিন
শরতে যে শাখা হোয়েছিল পত্রহীন[১]
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া
অচল [শিখর 'পরি] যে তুষার ছিল পড়ি
[এ দুদিনে কণা তার] যায়নি গলিয়া।

পাণ্ডু. পৃ. ৬২/৩২ খ

কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে[২]
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে[৩]
ক্ষুদ্র[৪] এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া!
দুদিনের পদচিহ্ন[৫] চিরকাল[৬] তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি। বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. ভারতী (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ), পৃ. ৬০ ; সন্ধ্যাসঙ্গীত, ১ম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ৭২ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড (১৩৪৬ আশ্বিন) পৃ. ৩৩।

পাণ্ডুলিপির ৫৭-৬৭ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে ৭৭-৮৭ সংখ্যক (রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাঠে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়: পাণ্ডুলিপির ৬২-৬৩ সংখ্যক ২টি ছত্র বর্জিত হয়েছে)।

পাণ্ডুলিপির শেষ স্তবকটি (ছত্র ৬২-৬৭ মুদ্রিত পাঠে ৮২-৮৭) কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত প্রথম স্তবকেরই (ছত্র ১-৯) পুনরাবৃত্তি।

১ হয়েছিল… : সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী

কবি প্রথমে লিখেছিলেন '……হোতে ঝোরেছে পল্লব' ; পরে তার পরিবর্তে ছত্রের উপরে লিখেছেন 'হোয়েছিল পত্রহীন।' শেষোক্ত পাঠই ভারতী, সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভৃতিতে গৃহীত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠে যে অংশ বর্জিত হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে তা কাটা হয়নি।

২, ৩ এই দুই ছত্র (পাণ্ডুলিপিতে ৬২-৬৩ : মুদ্রিতপাঠে ৮২—৮৩) রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত হয়েছে।

৪ কিন্তু : রবীন্দ্র-রচনাবলী

৫ পদচিহ্ন : ঐ

৬ চিরদিন : সন্ধ্যাসঙ্গীত; রবীন্দ্র-রচনাবলী

[বিষ ও সুধা]

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪ খ

[অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে[১]
দিবসের][২] অন্ধকার সমাধির পরে,
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
অতি ধীরে সাবধানে[৩] নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।
ভগ্ন দেবালয় খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে যার[৪] ছায়ি জীর্ণদেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি
আঁধারিয়া রাখিয়াছে হৃদয় যাহার,[৫]
দুয়েকটি বায়ুচ্ছ্বাস পথ ভূলি গিয়া

পাণ্ডুলিপিতে একই পাতার দুই পৃষ্ঠায় লেখা দীর্ঘ কবিতাটির শিরোনাম নেই। বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮) পৃ. ১১১-১৩২।
পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট পাতাটি উলটো করে বাঁধানো আছে। অর্থাৎ পরের অংশ আগে এসেছে; সেজন্য বর্তমান সংকলনে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার পৌর্বাপর্য হল ৮/৪খ এবং ৮/৪ক।
পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন আলোচ্য 'বিষ ও সুধা' কবিতার ১৮৮টি ছত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি ছত্র সম্পূর্ণ খণ্ডিত (সংখ্যা—১, ৪৮, ৪৯, ৫০, ১০০, ১৪৯, ১৫০); ২৬টি ছত্র আংশিক খণ্ডিত (সংখ্যা ২, ৪৩-৪৭, ৫১-৫৩, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১২১-১২২, ১৩১-১৩২, ১৩৯-১৪৫, ১৪৭-১৪৮, ১৫১)।
পাণ্ডুলিপির ২—১৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠেও ২—১৪ সংখ্যক।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১, ২ পাণ্ডুলিপির এ অংশ ছিন্ন

৩ সাবধানে অতি ধীরে

৪ তার

৫ ভগন হৃদয়

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪ খ

আঁধার আলয়ে তার হোয়েছে[১] আটক
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি!
শুন সন্ধ্যে আবার এসেছি আমি হেথা
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর বলধ্বনি শুনিতে এয়েছি!
হে তটিনী—ওকি গান গাইতেছ তুমি
দিন নাই রাত্রি নাই একতানে শুধু
এক স্বরে একি[২] গান গাইছ সতত!
এত মৃদুস্বরে—ধীরে—যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন না যায় ভাঙ্গিয়া![৩]
এ নীরব সন্ধ্যাকালে—তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনি[৪] মনে হয়
এ হৃদি গানের[৫] যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কি এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে[৬]
তাই লোয়ে এক স্বরে এক তানে সদা
একি গান গাইতেছ দিন রাত্রি ধরি!
সে গানের নাইক বিরাম অবসান।
হতভাগ্য কবি আমি কি বলিব আর—

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১১-১২।
পাণ্ডুলিপির ১৫—৩০ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে ১৫—৩০ সংখ্যক।

টীকা: গ্রন্থে পাঠান্তর

১ হয়েছে
২ এক
৩ ভেঙ্গে যায় পাছে
৪ শুনে
৫ গানেরি
৬ এই ছত্রের পরে ৩১—৩৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়নি।

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪ খ

যে কথা বলিতে যাই কহি সেই কথা
যে গান গাহিতে যাই গাই সেই গান!
এ পুরাণো কথা আর এ পুরাণো গান
কেহই—কেহই যদি না শুনিতে চায়
অভাগার অশ্রুসাথে অশ্রু না মিশায়—
তবে আর কাহারেও শুনাতে চাহি না—
গাহিব আপন মনে কাঁদিব আপনি—
তটিনীর কলস্বরে—নিশীথ নিশ্বাসে—
[ব]রষার অবিরল বৃষ্টি বারিধারে
[সে] গানের প্রতিধ্বনি পাইব শুনিতে!
[এস] স্মৃতি এস তুমি এ ভগ্ন-হৃদয়ে—
[সা]য়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মি-রেখা
[যেমন পড়েছে ওই] অন্ধকার মেঘে
[তেমনি ঢাল এ হৃদে অতীত-স্বপন!]
[কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া]
[কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!]
যা[হা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার]
সমস্ত মালতী[ময়—মালতী কেবল]
ছেলেবেলাকার[১] মোর স্মৃতির [প্রতিমা]
দুই ভাইবোনে মোরা আছিনু কেমন—

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন; মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮) পৃ. ১১২-১১৩
পাণ্ডুলিপির ৩৫—৪৪ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায় নি।
" ৪৫—৫৪ " " " " ৩১—৪০ সংখ্যক

টিকা: গ্রন্থে পাঠান্তর
১ শৈশবকালের

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪খ

আমি আছিলাম অতি শান্ত ও গম্ভীর[১]
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি— ৫৬
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী— ৫৮
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মত
সরম-সৌন্দর্য্য-ভরে ম্রিয়মান[২] পারা— ৬০
আছিল সে প্রভাতের ফুলটির মত[৩]
প্রশান্ত হরষে অতি[৪] মাখানো মুখানি— ৬২
সে হাসি গাহিত ধীরে[৫] উষার সঙ্গীত
সকলি পবিত্র[৬] আর সকলি বিমল। ৬৪
মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে পড়িত যেন প্রভাত-শিশির[৭] ৬৬
জাগিয়া উঠিত যেন প্রভাত পবন[৮]
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে! ৬৮
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি— ৭০
মালতী আঘাত দিত হৃদয়ের তারে[৯]
তাইতে শৈশব-গান উঠিত জাগিয়া[১০]। ৭২

পূর্বপৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম, সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১৩।

পাণ্ডুলিপির ৫৫—৭২ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে ৪১—৫৭ সংখ্যক।

টীকা: গ্রন্থে পাঠান্তর

১ আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর প্রকৃতি

২ ম্রিয়মাণ

৩ ফুলের মতন

৪ সদা

৫ শুধু

৬ নবীন

৭,৮ হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন

৯ …ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার

১০ …বাজিয়া

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪খ

এমনি আসিত সন্ধ্যা--শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
স্বর্ণ-সলিল-সিক্ত সায়াহ্ন অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ-চরণে
তারাময় যবনিকা দিত বিছাইয়া[১]—
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা
সন্ধ্যার সঙ্গীত-স্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব কবিতা!
হর্ষময় গর্ব্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক্ ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
মুখপানে একদৃষ্টে[২] রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন নির্দ্দোষ[৩]-গর্ব্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটীর আছিল আমাদের—
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি—
শান্ত কুটীরের কানে গাহিত কেমন[৪]
ঘুম পাড়াবার গান অতি ধীরে ধীরে।[৫]

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১৪।

পাণ্ডুলিপির ৭৩-৭৭ এবং ৭৮-৯০ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ৫৮-৬২ এবং ৬৫-৭৭ সংখ্যক।

টীকা: গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ছোট ছোট তারাগুলি দিত ফুটাইয়া

২ একদৃষ্টে মুখপানে

৩ মধুর

৪, ৫ এই দুই ছত্রের স্থলে মুদ্রিতপাঠে আছে
শান্ত কুটীরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটীরের স্বপন রচনা।

পাণ্ডু. পৃ. ৮/৪খ

চারিদিকে উঠিয়াছে পর্ব্বত শিখরী
সে পর্ব্বত শিরে মোরা উঠিতাম যবে
চারিদিকে যেত খুলে দৃশ্য মনোহর—
হেথা নদী—হোতা হ্রদ—হোথা নির্ঝরি [ণী]
গ্রামের কুটীরগুলি গাছের আড়ালে।
এইখানে—এইখানে শিখেছিনু আমি
কল্পনার কাছ হোতে সে সব কাহিনী
মর্ত্ত্যের ভাষায় যাহা নারি প্রকাশিতে
কল্পনা [হৃদ]য়ে মোর ধাত্রীর মত[ন]
প[1]... ... ...

পাণ্ডু. পৃ. ৭/৪ক

... ...দে এই বিশ্ব জগতের
বাহিরের আবরণ খুলে যায় যেন ;—
জগতের মর্ম্মগত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার
এ চোখের সামনে যেন হয় প্রকাশিত !
দুইজনে আছিলাম[2] কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে !
যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে
ক্রমশঃ বালক কাল হোল[3] অবসান...

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১৫।
পাণ্ডুলিপির ৯১-১০৪ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়নি।
" ১০৫-১০৯ এবং ১১০ সংখ্যক ছত্র মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ৭৮ ৮২ এবং ৯৭ সংখ্যক।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ পরবর্তী বিন্দু চিহ্নিত অংশ পাণ্ডুলিপিতে ছিন্ন ; মুদ্রিত পাঠেও পাওয়া যায়নি।

২ দুইজনে ছিনু মোরা

৩ হল

পাণ্ডু. পৃ. ৭/৪ক

নীরদের প্রেমদৃষ্টে পড়িল মালতী
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে—
দেখিতাম মালতীর সে শান্ত[১] হাসিতে
কুটীরের গৃহখানি রোয়েছে উজলি[২] !
শান্তির প্রতিমাসম বিরাজিত যেন !
সঙ্গীহারা হোয়ে[৩] আমি ভ্রমিতাম একা—
নিরাশ্রয় এ হৃদয় অশান্ত হইয়া—
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে,
কোথাও পেত না যেন আরাম বিশ্রাম !
[অ]ন্য মনে আছি যবে, হৃদয় আমার
[স]হসা স্বপন ভাঙ্গি উঠিত চমকি—
সহসা পেতনা ভেবে, পেতনা খুঁজিয়া—
আগে কি আছিল[৪] যেন এখন তা নাই !
প্রকৃতির কি যেন কি গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হোতে[৫]
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া—
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হোয়েছে[৬] তাহার—
সেই ছন্দে কি কথার পোড়েছে[৭] অভাব,
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১৬।
পাণ্ডুলিপির ১১১-১১৫ এবং ১১৭-১৩০ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ৯৮-১০২ এবং ১০৩-১১৬ সংখ্যক।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ শান্ত সে
২ কুটীরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে
৩ হয়ে
৪ ···ছিলরে
৫ হতে
৬ হয়েছে
৭ পড়েছে

পাণ্ডু. পৃ. ৭/৪ক

[হৃ]দয় সহসা তাই উঠিত চমকি !
[জা]নিনা কিসের তরে, কি মনের দুখে
একটি[১] দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি !—
শিখর হোতে[২] শিখরে—বন হোতে[৩] বনে
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি !
[এক]দিন নবীন বসন্ত সমীরণে
[বউ]কথা কও যবে খুলেছে হৃদয়,
[বিষা]দে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কি ভাব
[প্রা]ণের ভিতরে যবে রোয়েছে[৪] ঘুমায়ে
[দেখিনু] বালিকা এক নির্ঝরের ধারে—
[বনফুল তু]লিতেছে আঁচল ভরিয়া—
[দু পাশে] কুন্তল জাল পোড়েছে[৫] এলায়ে
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ
[কাছেতে]গেলাম তার—কাঁটা বাছি ফেলি
[কানন-গোলাপ তারে] দিলাম তুলিয়া।
[প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী,[৬]
তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,][৭]

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।
বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮), পৃ. ১১৭-১১৮।
পাণ্ডুলিপির ১৩১—১৫০ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিতপাঠে ১১৭-১৩৬ সংখ্যক।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ দুয়েকটি

২,৩ হতে

৪ রয়েছে

৫ পড়েছে

৬,৭ পাণ্ডুলিপির এ-অংশ সম্পূর্ণ ছিন্ন।

পাণ্ডু. পৃ. ৭/৪ ক [কহি] তাম বালিকারে [কত কি কাহিনী,]
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভূ[১]
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কি !—
কভু বা ভ্রূকুটী[২] করি রহিত বসিয়া—
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পালায়ে[৩] !
অলীক সরমে কভু হইত অধীর !
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, সরমে, সঙ্কোচে
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ।
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া—
একদিন সে বালিকা না আসিত যদি—
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেতনা কাটিয়া—
অবসাদে সারাদিন যেত যেন ধীরে ![৪]—
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী—
প্রভাতে অলসভাবে বসি তরুতলে—
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়

বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত।
মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮) পৃ. ১১৮।
পাণ্ডুলিপির ১৫১—১৬৮ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে ১৩৭—১৫৪ সংখ্যক।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ কভু
২ ভ্রূকুটি
৩ পলায়ে
৪ দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ চরণে

পাণ্ডু. পৃ. ৭/৪ ক

"দামিনী, তুমি কি মোরে ভালবাসো[১] বালা ?"
অলীক সরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া— ১৭০
ছুটিয়া[২] পলায়ে গেল দূর-বনান্তরে—
জানিনা কি ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া ১৭২
"ভালবাসি—ভালবাসি" কহিয়া অমনি
সরমে মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে ! ১৭৪
এইরূপে যেত দিন অস্ফুট স্বপনে ![৩]
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা— ১৭৬
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে
কিন্তু জানিতাম নাকো[৪] এই ভালবাসা ১৭৮
বালিকার ক্ষণস্থায়ী কল্পনা কেবল ॥[৫]
আর-কিছুকাল পরে এই দামিনীরে ১৮০
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে—
সুদূর-পর্ব্বতশিরে ইন্দ্রধনু যথা— ১৮২
মধুর সৌন্দর্য্য তুষে পথিক নয়ন—
যেমন নিকটে যাও অমনি তাহার ১৮৪
বিচিত্র বরণ যায় শূন্যে মিশাইয়া—

—॥—

মরিতে ॥ ছিলনা ॥ সাধ ॥ তোমাতরে ॥ ভাই— ১৮৬
জানি ॥ আমি ॥ গেলে ॥ আর কে রবে ॥ তোমার
আমার মতন ভাল কে বাসিবে আর ?— ১৮৮

পূর্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি ।

মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ (১২৮৮) পৃ. ১১৮-১১৯ ।

পাণ্ডুলিপির ১৬৯—১৭৯ এবং ১৮০—১৮১ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে ১৫৫—১৬৫ এবং ১৭২—১৭৩ সংখ্যক ।

পাণ্ডুলিপির ১৮২—১৮৮ সংখ্যক ছত্রগুলি মুদ্রিত পাঠে পাওয়া যায়নি ।

টীকা : গ্রন্থে পাঠান্তর

১ ভালবাস

২ ছুটে সে

৩ এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন-খেলা খেলি ।

৪ কি রে

৫ দুদিনের ছেলেখেলা আর কিছু নয় ?

[বৌ[১]-ঠাকুরাণীর হাট]

[উপহার / শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী / শ্রীচরণেষু]

[দিদি,/তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত সুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার ল'য়ে করে
সমর্পণ তরে]

পাণ্ডু. পৃ. ১৯/১০খ
কাছে থাকি, দূরে থাকি, দেখ আর নাই দেখ
শুধু স্নেহ দাও!
স্নেহ ক'রে ভাল থাক, স্নেহ দিতে ভালবাস'
কিছু নাহি চাও!
দূরে থেকে কাছে থাক' আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,
সুদূর প্রবাস হ'তে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়!
এত আছে, এত দাও, কথাটি নাহিক কও,
—স্নেহ-পারাবার,—
প্রভাত শিশির সম নীরবে ঝরিছে সুধা[২]
প্রাণের মাঝার[৩]।
তব স্নেহ প্রাণে মম[৪] নীরবে ভাসিয়া আসে[৫]
সৌরভের প্রায়,
উষার কিরণ সম[৬] নীরবে বিমল হাসি[৭]
প্রাণের জাগায়!

উদ্ধৃত উপহার-কবিতার ১৬টি ছত্র পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রিত পাঠে মোট ছত্রসংখ্যা ২৪; বন্ধনীবদ্ধ অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে গৃহীত। মুদ্রিত পাঠের জন্য দ্র. বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ /০, ৵০; রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭১-৭২।

১ বউ: রবীন্দ্র-রচনাবলী
২ পরাণে মম
৩ ঝরে স্নেহধার
৪ চারিপাশে
৫ কেবল নীরবে ভাসে
৬ নীরবে বিমল হাসি
৭ উষার কিরণ রাশি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা : উন্মেষ

১. প্রেক্ষাপট

সাহিত্যসৃষ্টি আর সাহিত্যচিন্তা এ দুয়ের যোগ সব সময় খুব প্রত্যক্ষ নয়। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি যে পরিমাণে আছে তার তুলনায় সেই সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পরিচয় অত্যন্ত কম। গ্রামীণ এবং ধর্মভিত্তিক সাহিত্যে এ রকম ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে না দেখলে, সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে সচেতন না হলে, যথার্থ সাহিত্যজিজ্ঞাসার উন্মেষ হয় না। সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে যে চেতনার ফলে বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার জাগরণ ঘটেছে, তা আধুনিক কালের দান।

সংস্কৃত সাহিত্য অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিদগ্ধ এবং আত্মসচেতন সাহিত্য। এই বৈদগ্ধ্য ও সচেতনতা এক সময় ভারতীয় সাহিত্যচিন্তাকে যে কী রকম ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছিল তা সকলেরই সুবিদিত। প্রাচীন বাংলানাহিত্যে যে দু-একটি ক্ষেত্রে সাহিত্য-সচেতনতার আভাস মেলে, তা বাঙালির নিজস্ব সাহিত্যজিজ্ঞাসার নিদর্শন নয়। তা সংস্কৃত সাহিত্যের সংসর্গ-সঞ্জাত এবং একান্তভাবে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অনুগামী। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পণ্ডিতবর্গ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

সাহিত্যের সৃজনশীলতায় ভাঁটা এলে সাহিত্যশাস্ত্র অনেক সময় সাহিত্যকে ছাপিয়ে যায়, সহজেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ওঠে। তখন অনুসন্ধানের শাস্ত্র অবধারিতভাবে অনুশাসনের শাস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের এই রকম পরিণতির কথা সর্বজনবিদিত। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে অলংকারশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠতা যে সর্বাংশে শুভ হয়নি, তার একটা কারণ বোধকরি এর মধ্যেই নিহিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে অনুসন্ধানের শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নি, অনুশাসন-শাস্ত্র রূপে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। এবং যথার্থ সাহিত্য-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এই অলংকারশাস্ত্রজ্ঞানই অনেকখানি পরিমাণে এঁদের স্বকীয় সাহিত্যজিজ্ঞাসার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও আমরা এরই জের দেখতে পাই।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমেই একটা বৈপরীত্য ও বিরোধের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। একদিকে শাস্ত্র যেমন জিজ্ঞাসার পথরোধ করে দাঁড়াল, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষাও তেমনি প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংযোগ সেদিন ইংরেজি শিক্ষিত নবীনদের চিন্তা ও ভাবজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়ে তুলল, তার ফলে প্রবীণ ও নবীনে ব্যবধান একেবারে দুস্তর হয়ে উঠল। প্রবীণেরা যেমন নতুন সাহিত্যের অভিনবত্বের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না, নবীনেরাও তেমনি পাল্টা প্রতিকূলতার ঝোঁকে ভারতীয় সাহিত্যচিন্তার মূল্যবান উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের অনেকখানি পরিমাণে স্বেচ্ছা-বঞ্চিত করে রাখলেন। একদিকে ঐকান্তিক অলংকার-শাস্ত্রমুখিতা এবং সমস্ত রকমের প্রাচীনপন্থিতা, অন্যদিকে নতুন কালের নতুন রুচি, নতুন চেতনা, নতুন সাহিত্য— এই হল ঊনবিংশ শতকের মধ্য পর্বে বাংলাসাহিত্যের সাধারণ প্রেক্ষাপট।

অনতিবিলম্বে অর্থাৎ এই মধ্য পর্বেরই শেষের দিকে এর মধ্যে আমরা আর-একটি নতুন জটিলতার সঞ্চার দেখতে পাই—আর-একটা নতুন ভাব-সংঘর্ষ। সে হল ক্লাসিক রোমান্টিক দুই প্রবণতার দ্বন্দ্ব, এবং পরের ধাপে, শুধু প্রবণতার নয়—দুই সাহিত্য-আদর্শের দ্বন্দ্ব।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথম দিকটাতে বিদেশ থেকে আমদানী করা বস্তু হলেও, কি ক্লাসিক কি রোমান্টিক, দুয়ের কোনোটিই বাঙালির পক্ষে শেষ পর্যন্ত বিজাতীয় হয়ে থাকে নি। আমাদের জীবন-সাধনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার ফলে, আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠাভূমি পেয়ে যাবার ফলে, এই দুই আদর্শই আমাদের সাহিত্যে কিছু পরিমাণে সত্য হয়ে উঠেছিল।

সকলেই জানেন, আমাদের ঊনবিংশ শতকের 'নবজাগরণে' পাশ্চাত্য অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদ এবং ঊনবিংশ শতকীয় রোমান্টিকতা দুয়েরই সংযোগ ঘটেছে। শেষেরটির সম্পর্কে অবশ্য কিছু বলাই বাহুল্য হবে, কিন্তু সেদিনের সেই 'নবজাগরণে'র মধ্যে যুক্তিবাদের স্থানও যে নগণ্য ছিল না, একথাও বোধকরি মোটামুটি তর্কাতীত। স্বল্প-পরিসর এবং অল্পকালস্থায়ী হলেও, পাশ্চাত্য এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের অনুরূপ একটি স্বচ্ছ যুক্তিপ্রধান জীবনাদর্শ সেদিনের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। রামমোহনে এর সূচনা, অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরে এর প্রতিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকালে এর গৌরবের মধ্যাহ্ন। বাঙালির এই ক্ষণস্থায়ী Age of Reason-টিই বাংলা সাহিত্যে খাঁটি ক্লাসিক আদর্শের ভিত্তিভূমি।

সাহিত্য-আদর্শের দিক থেকে দেখলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরকেই (১৮৭২ এপ্রিল থেকে ১৮৭৬ মার্চ) বোধকরি বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিক প্রভাবের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কাল বলে গণ্য করা যায়। তারপর, 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম পর্যায়ের পর (১৮৭৬) থেকেই এই প্রভাবে একটু একটু করে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। একসময়ে ইউরোপে যেমন ঘটেছে, আপন কালকে অতিক্রম করে' আসার ফলে ক্লাসিক সাহিত্য-আদর্শ ক্রমে সর্বপ্রকার প্রাচীনপন্থিতা ও গতানুগতিকতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যেও অবিকল অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার শুরু (১৮৭৭) থেকে একদিকে যেমন রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শ অল্পে অল্পে শক্তিশালী হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, অন্যদিকে ক্লাসিক সাহিত্য-আদর্শও তেমনি ধীরে ধীরে সাহিত্যিক রক্ষণশীলতার মুখপাত্র হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।[১] এইখানে এসে মনোধর্মের সাম্যের ফলে অলংকারশাস্ত্রমুখী দেশি রক্ষণশীলতা এবং ইংরেজি-শিক্ষিতদের অংশ-বিশেষের নব্য-ক্লাসিকপন্থী রক্ষণশীলতা পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে—সংস্কৃত এবং ইংরেজি ক্লাসিকপন্থিতার যুগ্ম প্রতিকূলতার মুখে—সাহিত্যচিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ (১৮৭৬)।

যে-প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ, তার একটা উপলক্ষও অবশ্য ঘটেছিল। উপলক্ষটা বাংলা মহাকাব্য। প্রাচীন কাল থেকেই মহাকাব্য জিনিসটা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ শাখা রূপে প্রভূত সম্মান পেয়ে আসছে। প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি, মহাকাব্য নাটক ইত্যাদির মর্যাদার তুলনায় গীতিরসাত্মক খণ্ড-কবিতা বা লিরিকের স্থান অনেক নীচে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্যরসের দৃষ্টান্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গীতাত্মক কবিতার উপরেই হয়তো বেশি নির্ভর করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা হিসাবে তার স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার দিকে তাঁরা বিশেষ দৃষ্টি দেন নি। লিরিকের যথার্থ প্রসার অসংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যে।

---

১ এখানে বলা আবশ্যক যে, যদিও 'ভারতী' পত্রিকা একসময় রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শের আত্মঘোষণার অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি বাহন হয়ে উঠেছিল, তা হলেও ক্লাসিক সাহিত্য আদর্শও এ পত্রিকায় স্থান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় নি। প্রথম দিকে দুই আদর্শের কোনটির প্রতিই এর বিশেষ পক্ষপাত তেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিক পর্যায়ের গীতিকবিতার উন্মেষ উনবিংশ শতকে, আধুনিক চেতনার হাত ধরে। এ গীতিকবিতা বহুল পরিমাণে ইংরেজি রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রভাবপুষ্ট। সুতরাং একথা সহজেই বোঝা যায় যে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ—লৌকিক সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ কম এবং ইংরেজি সাহিত্যে যাঁদের প্রবেশ কম, বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতাকে তাঁরা কিছুতেই অভিনন্দিত করতে পারবেন না। ভাবের দিক থেকে যতই অপরিচিত হোক, তবু উনবিংশ শতকের নতুন মহাকাব্যগুলিকে—অন্তত আকার-প্রকার ইত্যাদির খাতিরেও—তাঁরা শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। নতুন লিরিককে তা করতে পারেন নি। গীতিকাব্যকে উপেক্ষা করা এবং মহাকাব্যকে সমর্থন করা, এই ব্যাপারে তখন সংস্কৃতপন্থী রক্ষণশীল এবং পাশ্চাত্য-ক্লাসিকপন্থী রক্ষণশীল, এই উভয় দলই এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

নতুনের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবাদ যে প্রথমত মহাকাব্যের বিরুদ্ধেই আক্রমণের রূপ নেবে, এও স্বাভাবিক। নতুন সাহিত্যের সমর্থকদের পক্ষে এটাই ছিল সেদিনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যচিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ ঘটল। তখন তাঁর বয়েস সাড়ে পনেরো। এ যুদ্ধে তখন তিনিই সৈনিক, তিনিই সেনাপতি।

২. প্রথম প্রবন্ধ

এ যুদ্ধের দুটো মুখ। এক মুখে আক্রমণ, অন্য মুখে সমর্থন। আক্রমণের লক্ষ্য মহাকাব্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সমর্থনের বিষয় গীতিকাব্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার উপলক্ষ হল, অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত তিন খানি গীতিকাব্যের গ্রন্থ। তার একটি হল 'ভুবনমোহিনী' ছদ্মনামে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ১ম ভাগ (১২৮২ অগ্রহায়ণ, ১৮৭৫)। দ্বিতীয়, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর-সরোজিনী' ১ম ভাগ (১৮৭৬ মে)। আর তৃতীয়টি হল হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' (১৮৭৫ অক্টোবর)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা, 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা অবসরসরোজিনী দুঃখসঙ্গিনী'-নামের প্রবন্ধ এক সঙ্গে উক্ত তিন গীতিকাব্যের সমালোচনা। প্রবন্ধটি ১২৮৩ কার্তিক (১৮৭৬ অক্টোবর-নভেম্বর) সংখ্যার 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটির প্রথম অংশ ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশ সমালোচনা। দীর্ঘ ভূমিকার সমস্তটাই কাব্যতত্ত্ব। প্রবন্ধের এই অংশটাই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার বিষয় মহাকাব্য ও গীতিকবিতা। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ সাহিত্য-আদর্শ আত্মঘোষণায় মুখর হয়ে উঠেছে তা তখনকার বাংলাসাহিত্যে পক্ষে নিতান্তই অভিনব।

বালক রবীন্দ্রনাথের এই গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনা পরবর্তীকালের বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কী রকম কৌতুককর ঠেকেছিল তা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। সে যাই হোক, প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিন্তু মোটেই উপেক্ষা করবার মতো নয়।

প্রবন্ধটির রচনাকালে বাংলা মহাকাব্যধারা এবং গীতিকবিতাধারা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আপেক্ষিক প্রতিষ্ঠার দিকটা একটু লক্ষ করে দেখা দরকার। প্রথমে মহাকাব্যধারার কথাই ধরা যাক।

পনের বছর পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) পাঠক মহলে মহাকাব্য হিসাবে তখন পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এ প্রবন্ধের মাত্র এক বছর আগে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ড (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। হোমার ট্যাসো ভার্জিল দান্তে তখন বাঙালির কাছে আর সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়।

মিল্‌টন তখন বহুপঠিত এবং বহুসমাদৃত। অচিরে বাংলাসাহিত্যে আরো অনেক মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটবে, ভাবজগতে তারই যেন একটা প্রস্তুতি চলছে।

অন্যদিকে, গীতিকবিতার ধারাটিও তখন একেবারে উপেক্ষা করবার মতো নয়। নিধুবাবু প্রমুখ গীতিকারদের কথা যদি ছেড়েও দিই, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) বা তাঁর কোনো কোনো খণ্ড-কবিতার গীতিধর্মিতার কথা এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। ছয় বৎসর পূর্বে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' (১৮৭০) এবং পাঁচ বৎসর পূর্বে নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' ১ম ভাগ (১৮৭১) প্রকাশিত হয়েছে। দুটি গ্রন্থেরই বিভিন্ন কবিতা তখন পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

এ তো গেল কেবল খণ্ড-কবিতারই কথা। এ ছাড়া, অল্প-বিস্তর গীতিধর্মিতার স্পর্শযুক্ত রোমান্টিক কাব্যের স্থান তখন বাংলাসাহিত্যে রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত। মহাকাব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে লিরিকের সঙ্গে সঙ্গে এদের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। বিহারীলালের 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী' এবং 'নিসর্গসন্দর্শন' (তিনটি কাব্যই ১৮৭০-এ প্রকাশিত) তখন নিতান্ত অখ্যাত নয়। 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) বেশ কিছুকাল পূর্বেই অসম্পূর্ণ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (১৮৭১) এবং বছর দুয়েক আগে (১২৮১ সালে) সেই অবস্থাতেই 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। অসম্পূর্ণ হলেও 'সারদামঙ্গল' তখনকার একটি রুচিবান পাঠকমণ্ডলীর কাছে যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল এ কথা আমরা সকলেই জানি। অল্পকাল পূর্বে আরো দুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫)। আকারে কাব্য হলেও মেজাজের দিক থেকে এরা মহাকাব্যের প্রায় বিপরীত।

এইবারে বালক প্রবন্ধকারের নিজের কবিতা-রচনার দিকটায় দৃষ্টি দেওয়া যাক। আলোচ্যমান প্রবন্ধটি রচনার দু'বছর পূর্বেই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বেনামীতে তাঁর 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে (১৮৭৪)। এক বছর আগে হিন্দুমেলার অধিবেশনে (১৮৭৫) স্বরচিত 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি কলকাতার পাঠকসমাজে কিছু খ্যাতিও অর্জন করেছেন। কাছাকাছি সময়ে তাঁর 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার অল্প পরে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১৮৭৫)। রচনা বেনামীতে হলেও, সেই বছরই বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় সেটি পঠিত হয়েছে, কাজেই কবি তাঁর প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত থাকেন নি।[২] আলোচ্যমান প্রবন্ধটি রচনার মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার তিন সংখ্যায় তিন কিস্তিতে তাঁর 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু লিরিকই নয়, রোমান্টিক ভাবাকুলতায় 'প্রলাপ' প্রায় সার্থকনামা কবিতা।

এই প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের রোমান্টিক কাব্যরচনার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধপ্রকাশের প্রায় এক বছর আগে থেকে (১৮৭৫ নভেম্বর) তাঁর 'বনফুল' (১৮৮০) কাব্যটি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-এ ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে আসছে। উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় আমাদের আলোচ্যমান

২ 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ ১ম ও ২য় পর্যায় দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে 'শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ' (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত) ও বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮)-তে প্রকাশিত।

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সংখ্যাতেই 'বনফুলের' ৮ম সর্গ অর্থাৎ শেষ কিস্তিটি প্রকাশিত হয়। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনীর' আদর্শে রচিত এই 'কাব্যোপন্যাস'টি আকারে দীর্ঘ হলেও প্রকারে মহাকাব্য থেকে বহু দূরবর্তী।

রবীন্দ্রনাথের সামনে তাঁর আদর্শস্থানীয় কবি তখন বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরী। এবং কিছুটা দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'ভারত সংগীতে'র কবি হিসাবে হেমচন্দ্রের যে ধরণের প্রভাব এক সময় তাঁর উপর পড়েছিল, তা তখন অস্তাচলমুখী। অন্য দিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের রচনার সঙ্গে তখন তাঁর অল্প-স্বল্প পরিচয় হতে শুরু করেছে। কাল এবং পাত্র যখন এইভাবে যার-যার মতন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে—বাংলা-সাহিত্যে ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন সৃষ্টির ক্ষেত্র পেরিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ খুঁজছে, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ। নিরাসক্ত বিষয়-নিবেদন নয়, সুস্পষ্ট যুদ্ধ-ঘোষণা।

গীতিকবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত তরুণ প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অথবা তারই প্রতিরূপ— মহাকাব্য ও গীতিকবিতার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা— এ যেন অনেকটা অকাব্য আর কাব্যেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাঁর উপস্থাপনায় : মহাকাব্য বাংলা কবিতার অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক, গীতিকবিতাই মুক্তির একমাত্র পথ।

রবীন্দ্রনাথের সামনে মহাকাব্যের প্রতিনিধি হিসাবে তখন প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হলেন মধুসূদন। কিন্তু পরোক্ষেও আর-একজন আছেন। তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি যে ঠিক কতদূর প্রতিপক্ষ তা বলা কঠিন। কিন্তু তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কোনো কোনো দিক থেকে তিনি পূর্বসূরী এবং পথ-প্রদর্শক। আবার কোথাও কোথাও তিনিই প্রধান প্রতিবন্ধক।

গীতিকাব্যগ্রন্থের সমালোচনাকে উপলক্ষ করে' রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম গীতিকবিতার তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক তাই করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের বছর তিনেক পূর্বেই। সুতরাং এ বিষয়ে অনায়াসেই তিনি রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক রূপে গণ্য হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অনেকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্থাপিত প্রসঙ্গেরই জের। অনেকখানি, কিন্তু পুরোপুরি নয়। এইটেই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়।

'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮০ বৈশাখ (১৮৭২) সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৩] রচনার উপলক্ষ নবীনচন্দ্র সেনের গীতিকবিতার গ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' ১ম ভাগ (১৮৭১)। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাটক— এদের পারস্পরিক পার্থক্য এবং এদের প্রত্যেকের অধিকার-সীমা নির্ধারিত করে দেবার চেষ্টা করেন। তার কয়েক মাস পরে সেই বছরের (১২৮০) পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' একই বিষয়ের সূত্র ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'মানসবিকাশ'। এ প্রবন্ধের উপলক্ষ আর-একখানি গীতিকাব্যগ্রন্থ— দীনেশচরণ বসু রচিত 'মানসবিকাশ' (১৮৭৩)। এই সমালোচনা প্রবন্ধটিই পরে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রকাশিত হয়।[৪]

---

৩ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, বঙ্কিমচন্দ্র— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ, পৃ ৪৬-৪৯

৪ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, বঙ্কিমচন্দ্র— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ, পৃ ৫৩-৫৭। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে, 'মানস-বিকাশ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সময় তার আখ্যাপত্রে রচয়িতার নাম ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা থেকে কেউ কেউ এটিকে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা বলে ভুল করেছিলেন। সাহিত্য সাধক চরিতমালার (ব. সাহিত্য পরিষদ্) ৪২নং পুস্তিকা 'দীনেশচরণ বসু', পৃ ৩৫, দ্রষ্টব্য।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন ধরণের বাঙালি গীতিকবিদের গোত্র-নির্ণয় করে' প্রত্যেক গোত্রের বিশেষত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, উপলক্ষ ও অনুষঙ্গের তফাৎ থাকলেও দুটি প্রবন্ধেরই মূল আলোচ্য এক : বাংলা গীতিকবিতা। লক্ষণীয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ দুটিতে তত্ত্ববিশ্লেষণ আছে বটে, কিন্তু মহাকাব্য-গীতিকাব্য ঘটিত প্রশ্নে কোনো তুলনামূলক উৎকর্ষ-অপকর্ষের ইঙ্গিত নেই, কোনোরকম পক্ষ-সমর্থনের ভাব নেই। বিশেষ একটা দিকের সমর্থকের পক্ষে— উৎকর্ষের ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা-কামীর পক্ষে, বিশেষতঃ যিনি গীতিকবিতার পক্ষপাতী তাঁর পক্ষে— বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ দুটি যে যুগপৎ অতৃপ্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,— স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অনুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

নাটকের কথা যাক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে গীতিকাব্য আর মহাকাব্য এ দুয়েরই সাহিত্যমূল্যের সমানভাবে স্বীকৃতি দিলেন, গীতিকবিতার সমর্থকের এইখানেই আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে মহাকাব্য ও গীতিকবিতার সাহিত্যগুণের তুলনা করে নিঃসংশয়ে গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ঘোষণা করলেন। বললেন, "মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি।······মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত হইয়াই আছে, প্রকাশ করিলেই হইল।······গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজেদের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিই লক্ষ করবার মতো। "বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই।" প্রবন্ধটিতে সুস্পষ্ট পক্ষসমর্থন নাই বটে, কিন্তু শ্লেষ আছে প্রচুর। সে শ্লেষ মহাকাব্যকে স্পর্শ করে না, কিন্তু গীতিকবিদের বা গীতিকবিতার সমর্থকদের তা স্পর্শ না করে পারে না। বাংলাসাহিত্যে গীতিকবিতার আধিক্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উপর দেশের জলবায়ু খাদ্য ইত্যাদির প্রভাবের কথা বলেছেন এবং বাংলা দেশের আর্দ্র কোমল জলবায়ু এবং অসার তেজোহানিকর খাদ্যের ফলে বাঙালিচরিত্রে যে বিশেষত্বের জন্ম হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, "এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহ-সুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। এই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য,

৫ রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধটির উদ্ধৃতিগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকার (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯) পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩১৭-২৯, থেকে গৃহীত।

অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ।[৬]......অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি-চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।"

শুধু এই মন্তব্যই নয়, এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী গীতিকবিদের যেভাবে সুস্পষ্ট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— জয়দেবাদি বহির্মুখ কবি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদি অন্তর্মুখ কবি এবং তৃতীয়ত 'আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী 'আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণ'— এই ত্রিধা বিভাগও আধুনিক বাঙালি গীতিকবিদের কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হবার মতো নয়। বঙ্কিমচন্দ্র একান্ত বহির্মুখিতা ও একান্ত অন্তর্মুখিতা দুয়েরই নিন্দা করেছেন। আধুনিক গীতিকবি বঙ্কিমচন্দ্রের কথার প্রথমাংশ সানন্দে সমর্থন করবেন। দ্বিতীয়াংশ তাঁর বিশেষ মনঃপুত হবে না। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথেরও হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার তুলনামূলক আধিক্যের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাতে লজ্জার কিছু পান নি। এটাই তাঁর কাছে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলে মনে হয়েছে। গীতিকবিতা যে বাঙালির 'জাতিচরিত্রানুকারী', তাও রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর মতে সেইখানেই গীতিকবিতার সত্যতা, সেইখানেই তার শক্তি।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, মহাকাব্য এ কালের জিনিস নয়, প্রাচীন কালের জিনিস— সেইকালের যে কালে "লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না।" কিন্তু সেইকাল যেহেতু এখন নিঃশেষে বিগত, সেই হেতু এখনকার দিনে আর সার্থক মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়।[৭] গীতিকাব্য সকল কালেরই। "গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে।"

বাংলা মহাকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট। "এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধ-হৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।"

গীতিকবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তাতে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোনো সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতি-

৬ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' (১৮৭৪) বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চাভিলাষ-সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদরূপে গণ্য হতে পারে কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

৭ এখানে লক্ষণীয় যে, প্রাচীন মহাকাব্য— যাকে authentic epic বলা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি নেই। তাঁর আপত্তি সেই মহাকাব্যে যা আপন কালকে অতিক্রম করে— যাকে আমরা literary epic বলি। অর্থাৎ বাল্মীকি বা হোমারে তাঁর আপত্তি নেই, আপত্তি মিল্টনে বা মধুসূদনে।

কাব্যের উৎপত্তি।··· যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই···।"

গীতিকাব্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল এবং অমিল দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। দুজনেরই মতে গীতিকবিতা হল হৃদয়ের ভাবপ্রকাশ। উপরন্তু, রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিক কালের সমস্ত সার্থক কবিতাই কবির আত্মহৃদয়ের ভাবপ্রকাশ, অর্থাৎ সমস্ত সার্থক কবিতাই গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বলেননি। তিনি অন্যতর কবিতার অস্তিত্ব এবং সার্থকতা স্বীকার করেছেন। এইখানেই আসল মতভেদ। এ মতভেদের ভিত্তি সাহিত্যরুচিতে এবং সাহিত্য-আদর্শে। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ক্লাসিকে রোমান্টিকে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বিশুদ্ধ রোমান্টিক আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কতকগুলি দিক থেকে যেমন পূর্বসূরীর আলোচনার অনুবৃত্তি বা পরিপূরক, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে তেমনি তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

৩. মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনা, প্রথম পর্যায়

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' -ইত্যাদি প্রবন্ধের এক বছরের মধ্যে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১২৮৪ শ্রাবণ, ১৮৭৭)। ভারতীর প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সমালোচনা-প্রবন্ধ— 'মেঘনাদবধ কাব্য' বের হতে আরম্ভ করে। প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ। শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন, মাঝখানে অগ্রহায়ণ ও মাঘ দু' মাস বাদ— এই ছয় সংখ্যায় ছয় কিস্তিতে প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও প্রথমেরই অনুরূপ : মহাকাব্যের খণ্ডন ও গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠা প্রথম প্রবন্ধে তাঁর অভিযান তত্ত্বের ভূমিতে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তথ্যের ক্ষেত্রে। মহাকাব্যের বিরুদ্ধে তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে যে সব অভিযোগ সঞ্চিত হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলিই প্রথম প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে। সে দিক থেকে নতুন বক্তব্য কিছু নেই। কিন্তু তথ্যগত যুক্তিপ্রমাণের সাহায্য না পেলে তত্ত্ব কেবল নিজের জোরে প্রতিষ্ঠা পায় না। প্রথম প্রবন্ধে খাঁটি সমালোচনা-অংশটি সেদিক থেকে দুর্বল— ভূমিকা-অংশের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে নি। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি এই অপূর্ণতাকে দূর করেছে।

প্রবন্ধটি খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা : 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার খণ্ডন; তার মহত্ত্বের দাবির অসারতা প্রতিপাদন। কালাতিক্রান্ত মহাকাব্য অর্থাৎ আধুনিক মহাকাব্য যে যথার্থ কাব্য নয়, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সুবিস্তৃত সমালোচনা যেন এই কথাটাকেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা।

এই প্রবন্ধের একটি জিনিস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দোষ-প্রমাণের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক ভাবে বাল্মীকি, হোমার ও মিল্টন থেকে প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত সমূহ উৎকলিত করে দিয়েছেন। বাল্মীকি হোমার সম্পর্কে কিছু বলবার নেই, কেননা তাঁদের মহাকাব্য প্রাচীন কালের বস্তু। কিন্তু মিল্টনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে 'সাহিত্যিক এপিক'-এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বগত অভিযোগ অলক্ষ্যে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতার সম্পর্কে এখানে কতটা সচেতন ছিলেন বলা কঠিন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যে তিনি এই ত্রুটি সংশোধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ পরবর্তী একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যাবে, যেখানে উপলক্ষ থাক আর না-থাক, মিল্টনই রবীন্দ্রনাথের

আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমাদের বর্তমান বিষয়-পরিধির বাইরের।

প্রচুর উদ্‌ধৃতি এবং বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনেক দোষত্রুটির উল্লেখ করেছেন, অনেক অসঙ্গতি ও অনৌচিত্য উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এই সমালোচনা কতদূর যুক্তিযুক্ত তার বিচার করা, অথবা সমালোচনা হিসাবে এই প্রবন্ধের উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের নিরূপণ করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয়। এখানে আমাদের আসল প্রশ্ন তত্ত্ব নিয়ে। সেদিক থেকে এখানে এইটেই আমাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রথম প্রবন্ধের পর তত্ত্বের দিক থেকে এ প্রবন্ধে নতুন কোনো সংযোজন ঘটে নি। এ প্রবন্ধ প্রথম প্রবন্ধেরই পরিপূরক। এবং এইখানেই একটা পর্বাঙ্গের পরিসমাপ্তি।

এর পরে প্রায় তিন বছরের একটি দীর্ঘ ছেদ। 'মেদনাদবধ' প্রথম পর্যায়ের শেষ কিস্তি প্রকাশিত হবার সাত মাস পরে, ১২৮৫ আশ্বিনে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথের প্রথমবারের বিলেতযাত্রা। তারপর, এক বছর পাঁচ মাস প্রবাসযাপনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন। তারও বেশ কয়েক মাস পরে, ১৮৮৭ ভাদ্র (১৮৮০) সংখ্যার 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা-বিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধ। নাম, 'বাঙালি কবি নয়'। প্রবন্ধটি পরে সংক্ষিপ্ত আকারে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা'-গ্রন্থে (১৮৮৮) মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের ঠিক এক মাস পরে ভারতীর ১২৮৭ আশ্বিন সংখ্যায় পূর্ব-প্রবন্ধের জের হিসাবে আর একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'বাঙালি কবি নয় কেন'।[৮] ভাব ও বিষয়-সাম্যের কারণে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই স্বীকৃত। প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার একটি নতুন কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাব-বীজের সাক্ষাৎ পাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনায় এইখানেই কল্পনা-ঘটিত প্রত্যয়টির প্রথম আত্মপ্রকাশ। সুতরাং এইখান থেকেই দ্বিতীয় পর্বাঙ্গের সূচনা বলে' ধরা যেতে পারে।

৪. উপসংহার : নতুন কাব্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধ দুটির মধ্য দিয়ে যে-একটি বিশেষ ধরণে কাব্যতত্ত্ব আভাসিত হয়ে উঠেছে, সে কোন্ কাব্যতত্ত্ব? তার পরিচয় কী? এ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর আমরা আগেই পেয়েছি।

এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সাহিত্যচিন্তাকে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ক্লাসিক বা রোমান্টিক, এই রকম প্রচলিত কোনো লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করায় বিপদ আছে। কিন্তু উন্মেষলগ্নের এই অর্ধস্ফুট সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে সে কথা চলা চলে না। যে মৌল প্রত্যয়গুলি এখানে তাঁর আলোচনার প্রধান অবলম্বন, সেগুলির দিকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিপাত করলেই এই সাহিত্যতত্ত্বের চরিত্র-লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক, কবিতা হল ভাবপ্রকাশ। ভাবপ্রকাশ কী? ভাবপ্রকাশ হল, হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতিকে ঢেলে দেওয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের ভার লাঘব করা। কবিতা "আমাদের হৃদয়ের প্রস্রবণজাত···স্রোত।" ঠিক যেমন ওয়ার্ডস্বার্থ বলেছেন, "The spontaneous overflow of power-

৮. প্রবন্ধটি অদ্যাবধি (১৯৬৬) কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি।

ful feelings" (Lyrical Ballads-এর মুখবন্ধ)। মিল্ যাকে বলেছেন "expression or uttering forth of feeling" (Early Essays)।

দুই, কবিতা গঠন বা সংগ্রহ নয়, যান্ত্রিকভাবে কিছু নির্মাণ করা নয়। কবিতা কৃত্রিম শিল্পকর্ম নয়। কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণধর্মী, জীবন্ত—স্বাভাবিকভাবেই বিকাশধর্মী, যাকে বলা হয়েছে—'organic growth'।

এখানে স্মরণীয় যে, কবিতার বা আর্টের এই জীবনধর্মিতার কথা গ্যেটে খুব জোর দিয়ে বলেছেন। শেলিং-ও এই কথাটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহিত্যতত্ত্বেও বারবার এর সাক্ষাৎ পাই। বস্তুত, আর্ট যে প্রাণধর্মী, এ কথা রোমান্টিক আন্দোলনের আদিপর্ব থেকেই ঘোষিত হয়ে আসছে। কোল্‌রিজের কল্যাণে এ-তত্ত্ব ইংরেজি সাহিত্যেও সুপরিচিত : organic কথাটি কোল্‌রিজের সাহিত্য-ভাবনার একটি কেন্দ্রস্থ প্রত্যয়।

স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার কথায় রবীন্দ্রনাথ যেমন ফুলের সহজ আত্মপ্রকাশের তুলনা দিয়ে বলেছেন, কবিতা "আমাদের হৃদয়কাননের পুষ্প", কীট্‌স্-ও তেমনি গাছের স্বাভাবিক পত্রোদ্‌গমের তুলনা দিয়ে বলেছেন, "…if Poetry comes not as naturally as the Leaves to a tree it had better not come at all" (Letters)।

তিন, "গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি।" মিল্ স্পষ্টই বলেছেন যে, কবিতা মাত্রেই কবির স্বগতোক্তি (Early Essays)। শেলি তাঁর Defence of Poetry-তে ঘোষণা করেছেন, "A Poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds"। এ বিষয়ে কীট্‌সের বক্তব্যও সুস্পষ্ট : "I never wrote one single line of Poetry with the least Shadow of public thought" (Letters)।[৯]

চার, যে বস্তু "পরহৃদয়ের অনুকরণ মাত্র," তা যথার্থ কবিতা নয়। এখানে অনুকরণ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর্ট মাত্রেই অনুকরণ, এই হল ক্লাসিক্যাল শিল্পতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা। অন্যপক্ষে, রোমান্টিক শিল্পতত্ত্ব ঠিক বিপরীত কথা বলে। আর্ট কখনোই অনুকরণ নয়। আর্ট হল সৃষ্টি, যাকে বলা হয় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথও এখানে অবিকল সেই কথাই বলেছেন। উপরন্তু বলেছেন যে, মহাকাব্য পরহৃদয়ের অনুকরণ বলেই তা খাঁটি কবিতা নয়। গীতিকবিতাতেই যথার্থ আত্মভাবের প্রকাশ। সুতরাং গীতিকবিতাই যথার্থ কবিতা—সর্বাঙ্গীণভাবে কবিতা।

প্রত্যয়গুলির সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যাদর্শে এর প্রত্যেকটিরই সাক্ষাৎ মিলবে। প্রত্যয়গুলি যতই মূল্যবান হোক না কেন, বাংলাসাহিত্যে এরা যতই নতুন হোক না কেন, এগুলির কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তার ফল বলে দাবি করা যায় না। এরা যে রবীন্দ্রচিন্তায় কিছুমাত্রও স্বাঙ্গীকৃত হয় নি এমন বলি না। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নিজের হয়ে উঠতে গেলে যতখানি স্বকীয় চিন্তার ভিত্তিভূমি দরকার, তখন পর্যন্ত তা রচিত হয়ে ওঠে নি।

---

৯ পরবর্তীকালে ক্রোচেও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। শুধু কবিতা নয়, ক্রোচের মতে আর্ট মাত্রেই লিরিকধর্মী। ক্রোচে এবং রোমান্টিকদের যুক্তি হয়তো ভিন্ন, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মোটামুটি একই। সাহিত্যচিন্তার সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথও এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থক ছিলেন। পরে যে ছিলেন না, এ কথা অনেকেরই সুবিদিত। কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির বাইরে।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যচিন্তার যে সুনিবিড় যোগ আমরা সব সময় লক্ষ করি, এখানে তেমন কোনো নিবিড় যোগের চিহ্ন নেই। থাকা অবশ্য সম্ভবও নয়। কেননা এখন পর্যন্ত তাঁর দর্শনচিন্তার উন্মেষ ঘটবার সময় আসে নি। সে লগ্ন এখনো অনেক দূরবর্তী। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সাহিত্যচিন্তার উন্মেষের জন্যও আমাদের সেই লগ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও তাঁর দর্শনচিন্তা প্রায় অভিন্ন বস্তু—দুয়ের বিকাশও অভিন্ন।

পনেরো ষোলো বছর বয়েসের কিশোরের কাছে চিন্তার ক্ষেত্রে যতদূর আমরা আশা করতে পারি, এ প্রবন্ধ দুটিতে তার অতিরিক্ত অনেকখানি পাওয়া যাবে। কিন্তু রচয়িতা যতই প্রতিভাবান হোন, পরিণত বয়েসের মননের ফসল অপরিণত বয়েসে মিলবে না। উদ্বৃত্ত, লীলা, আনন্দ, সামঞ্জস্য প্রভৃতি ভাব-বীজ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় যে ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে যেভাবে একটি অখণ্ড ও রমণীয় সমগ্রতার মধ্যে এরা আত্মপ্রকাশ করেছে, বলা বাহুল্য, এ পর্বে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এ পর্ব নিতান্তই সূচনা, তার বেশি নয়।

৫. পুনশ্চ

আরো একটা কথা এখানে উল্লেখ না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কথাটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় ভারতীয় সাহিত্য-আদর্শের প্রভাব প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্য-ভাবনায় এ প্রভাব কতখানি সত্য বা সার্থক তার বিচার এখানে আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। এখানে আমরা শুধু সূচনাপর্বের সম্পর্কেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। পূর্বের আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত বোধকরি মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, এ পর্বে ভারতীয় সাহিত্য-আদর্শের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাবের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-প্রবন্ধটিতে মধুসূদনের উপমা-প্রয়োগের সংকীর্ণতার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার 'সাহিত্যদর্পণে'র কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে উল্লেখ কোনো গভীর পরিচয় সূচিত করে না। এ যেন অনেকটা উল্লেখের জন্যেই উল্লেখ করা। উল্লেখটি মাত্র উপমার প্রসঙ্গেই, তাও অনেকটা ভাসা-ভাসা। সাহিত্যদর্পণকারের কাব্যাদর্শের সঙ্গে এ উল্লেখের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রবন্ধের অন্যত্রও কোথাও বিশ্বনাথের মতামতের কোনো ছাপ পড়ে নি। বস্তুত, আলোচ্যমান প্রবন্ধ দুটির কোনোটিতেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনথের বয়েসটাও তখন সে রকম পরিচয়ের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু, বয়েসের বাধার কথা তুললে, প্রভাব-প্রসঙ্গের অন্য দিকটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পক্ষেই কি এই বয়েসকে যথেষ্ট বলা চলে? অথচ সে-পরিচয়কে তো নিতান্ত মৌখিক পরিচয় এমন বলার উপায় নেই?

আসলে বয়েসের বাধাটাই এখানে একমাত্র কথা নয়। রুচির বাধাও কিছু থাকতে পারে, কিন্তু সেটাও মুখ্য নয়। আসল বাধার মূলটা রয়েছে সেদিনের ইতিহাসে। যে একটা প্রচণ্ড মানসিক বিরুদ্ধতা সেদিন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বাধার আসল রহস্য সেইখানে। সেদিনকার সাংস্কৃতিক ভাব-পরিমণ্ডলে নতুন ও পুরাতন সাহিত্যভাবনা যে বিরুদ্ধতা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল তার

কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।—

রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Literature of Bengal'[১০] বইটি প্রকাশ হওয়ার (১৮৭৭) প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'ভারতী' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় তার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি বেনামী— 'চ'-স্বাক্ষরিত। প্রবন্ধটির নাম 'বঙ্গসাহিত্য'। এই 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনার প্রথম কিস্তি 'ভারতী'র একই সংখ্যায় (প্রথম সংখ্যা, ১২৮৪ শ্রাবণ, ১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। মেঘনাদবধ-সমালোচনায় নতুন সাহিত্যরুচির উচ্চকণ্ঠ আত্মপ্রকাশ, 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধটি ক্লাসিকপন্থী সাহিত্যরুচির— বিশেষ করে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রমুখী সাহিত্যরুচির ততোধিক উচ্চকণ্ঠ আত্মঘোষণা। এই দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন রচনাই বেশ কয়েক সংখ্যা ধরে 'ভারতী'তে পাশাপাশি প্রকাশিত হতে থাকে।

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক। আমাদের আসল প্রশ্নটা দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক— মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর সাহিত্য-আদর্শও অল্পবিস্তর পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শ। 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধের সমালোচকের মতামত সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যতত্ত্ব নিরূপণে রমেশচন্দ্র যে 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথের 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এই কথাতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, এই মহাবাক্যকে পাশ কাটিয়ে রমেশচন্দ্র যে পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রীদের সংসর্গে পড়ে' নতুন পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন, সমালোচকের চোখে এইটেই রমেশচন্দ্রের মৌলিক ত্রুটি।

'ভারতী'র সমালোচক এই উপলক্ষে 'সাহিত্যদর্পণ'-কারের কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে' পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের তুলনায় বিশ্বনাথের কাব্যতত্ত্বের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রসঙ্গত রমেশচন্দ্রকে, প্রাচ্য সাহিত্য-আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার জন্যে মৃদুভাবে কিছু তিরস্কারও করেছেন।[১১]

সমালোচকের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো। তিনি লিখেছেন (ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ, পৃ ২৮),……"আমাদের বোধহয় গ্রন্থকার কোন ইংরাজ আলংকারিকের প্রলাপ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাহাদের কূট তর্কের চাকচিক্য ও প্রগল্‌ভতার আড়ম্বরে প্রতারিত না হইয়া যদি সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কেহ আর হেজ্‌লিটের মতন কবিতার শত সহস্র লক্ষণ নির্দেশ করিবে না, কিম্বা ষ্টুয়ার্ট মিলের মতন কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া হতাশ হইবে না।"

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি— বিশেষত 'সাহিত্যদর্পণে'র প্রতি সমালোচকের শ্রদ্ধা অগাধ। এ শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এক কথায় ওয়ার্ডস্বার্থ-কোলরিজ-শেলির কাব্যতত্ত্বকে 'ইংরাজ আলংকারিকের প্রলাপ-বাক্য' বলে উড়িয়ে দেওয়াটা কতখানি সাহিত্যবোধ-প্রসূত, আর কতখানিই-বা দলীয় উত্তেজনা-প্রসূত তাও বিবেচনা করে দেখবার মতো। এই যে তাবৎ রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বকে

---

১০ প্রথম প্রকাশ 'Ar Cy Dae' এই ছদ্মনামে। ১৮৯৫-এ সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণটি রমেশচন্দ্রের স্বনামেই প্রকাশিত হয়।

১১ ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে রমেশচন্দ্রের সুগভীর প্রবেশের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু যে গ্রন্থগুলি সেই প্রবেশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেগুলি তখনো রচিত হয়নি। তাছাড়া, আলোচ্যমান গ্রন্থটি তাঁর স্বনামে প্রকাশিত নয়।

'প্রগল্‌ভতার আড়ম্বর' বলে ধিক্কৃত করা— আমাদের বর্তমান অলোচনার দিক থেকে এইটেই লক্ষ করবার। কেননা যোদ্ধভাবের প্রকাশটা এইখানেই— মেজাজের বিরুদ্ধ ভাবটা এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

এই যোদ্ধভাবটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নিতান্ত সাময়িকও নয়। এ হল তখনকার দিনের আধুনিকতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিকূলাচরণের অন্যতম অভিব্যক্তি। এই প্রতিকূলতাই যদি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার উষালগ্নে— তাঁর সেই অপরিণত বয়সে— তাঁকে একটু বেশি রকম পশ্চিমাস্য করে' দিয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এ প্রতিকূলতা যে কেবল প্রতিকূলতাই নয়, এর মধ্যে যে জাতির একটি নিগূঢ় ইচ্ছাও নিহিত আছে— জাতির একটি সুগভীর উৎকণ্ঠাও যে এই বেদনাময় প্রতিকূলাচরণের মধ্যে দিয়েই ভাষা পেতে চেষ্টা করছে, এ সত্য তখন না হলেও পরে এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। যথাসময়ে সাহিত্যচিন্তাতেও তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু সে কাহিনী এ সময়ের নয়। অনেক পরবর্তী কালের।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদকের নিবেদন

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ ও সম্পাদন। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে মালতী-পুঁথি মুদ্রিত হয়েছিল, বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হল মালঞ্চ নাটক। প্রথম খণ্ডের সম্পাদক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে এই নাটকটি মুদ্রণের প্রস্তাব করেছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডক্টর ভট্টাচার্য রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করায় রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার দায়িত্বভার বর্তমান সম্পাদকের উপরে ন্যস্ত হয়। সে দায়িত্ব কতটুকু সার্থকভাবে পালিত হয়েছে জানি না, তবে প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের প্রেরণায় এবং বর্তমান উপাচার্য ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের আগ্রহে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের হাতে মালঞ্চের কবি-কৃত নাট্যরূপটি তুলে দিতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি।

কবির স্বহস্তে সংশোধিত ও সংযোজিত মালঞ্চের নাট্যরূপের যে-পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মালঞ্চ নাটক মুদ্রিত হয়েছে তার প্রথম খাতার উপরে লিখিত শিরোনামটি মুদ্রিত গ্রন্থে যথাযথ রক্ষিত হল। পাণ্ডুলিপির পরিচয় দান, প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেষণ, রচনার কাল নিরূপণ, পাঠান্তর বিচার ও পাঠগত মিল নির্দেশ ইত্যাদি যথাস্থানে সাধ্যমতো সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই খণ্ডে প্রকাশিত 'মালতী-পুঁথির পরিশিষ্টে'র প্রথম পর্যায় রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রবীন্দ্রভবনের গবেষণা-সহায়ক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। মালতী-পুঁথির যে-সব রচনা রবীন্দ্রনাথের শৈশব-সঙ্গীত, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রুদ্রচণ্ড, সন্ধ্যাসঙ্গীত ও বউঠাকুরাণীর হাটে মুদ্রিত হয়েছে, সেইগুলি এখানে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থানুযায়ী বিন্যস্ত হল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি পাদটীকায় যথারীতি উল্লেখ করা গেল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা : উন্মেষ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আকারে ছোটো হলেও আশা করি রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এই খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি এবং মালঞ্চ নাটক, মালঞ্চ উপন্যাস ও মালতী-পুঁথির কয়েকটি পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হল।

পরিশেষে, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীগোপেশচন্দ্র সেন, বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায় ও বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর সুশীল রায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।